গল্প আর প্রমাণ

তুষার চট্টোপাধ্যায়

সবুজ রক্ত
পাখীর দুধ
সাঁতারু হাতি
কাঠের গরু
জলের 'পেলে'
সোনার মাছ
পাহাড়ের গান
তিমির পিঠে চাপড়

মাছ বৃষ্টি
দুধ বৃষ্টি
দুধ গাছ
ফুলের গোপন কথা
পেরেক খোর পাখী
পোকার নামে স্মৃতিসৌধ
কিন্নরকণ্ঠী গুগুলী
মাকড়সার জালে বোনা ছবি
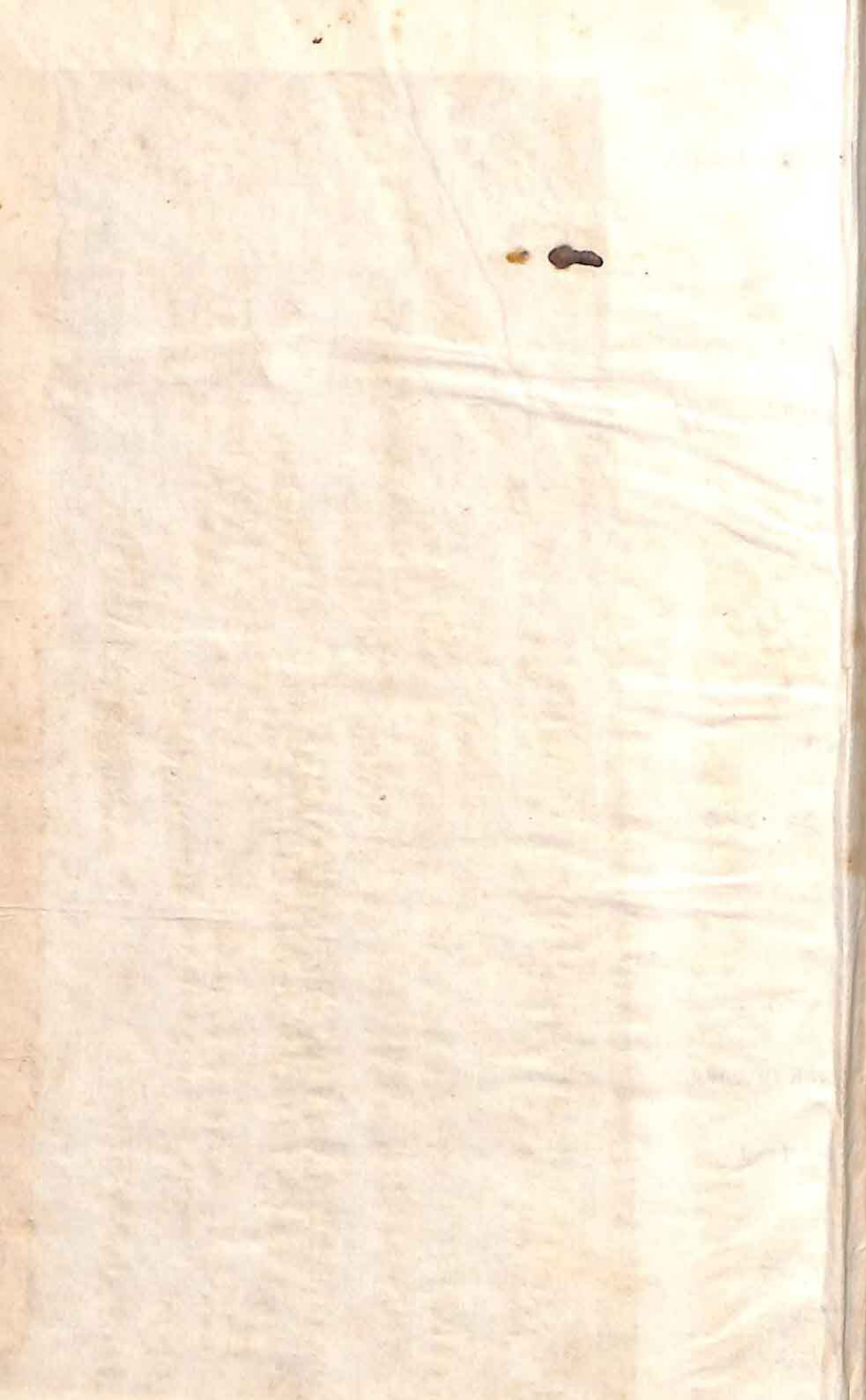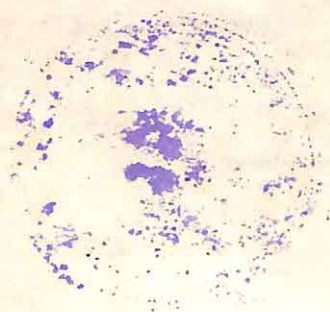
গল্প আর প্রমাণ

(ভাষান্তর)

ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়

নন্দিতা পাবলিশার্স

প্রাপ্তিস্থান ঃ—বুক ফ্রেন্ড, ৮/১/বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলি-৭৩

প্রকাশক ঃ—
রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র
নন্দিতা পাবলিশার্স
১৩৮/৯ এন. এম. রোড
কলিকাতা-৭০০০১১

প্রচ্ছদ ঃ পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

প্রথম নন্দিতা সংস্করণ ঃ শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৯৪

মূল্য ঃ পনের টাকা।

মুদ্রাকর ঃ—
শ্রীসত্যহরি পান
উপেন্দ্র প্রিন্টিং প্রেস
১৬, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

যিনি এই বইটা দেখলে সবচাইতে
খুশী হ'তেন, অথচ যাঁকে এটা দেখাবার
কোন উপায়ই জানা নেই—
তাঁকে

আমাদের প্রকাশিত ছোট ও বড়দের কয়েকটি বই

শিব্রাম চক্রবর্তী শিব্রামের এক ডজন গপ্পো—৮·০০

*লীলা মজুমদার—(হাসির, মজার ও ভূতের বাছাই করা গল্প)

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—১৬·০০

*লীলা মজুমদার (সম্পাদনায়) ১৬ জন নামকরা সাহিত্যিকের বিখ্যাত গল্পের সংকলন ফুলমালা—৭·০০

মহাশ্বেতা দেবী (১২টি মজাদার জাতকের গল্প সংকলন) জাতকের গল্প—৭·০০

মঞ্জিল সেন (সম্পাদনায়) **প্রত্যেক সাহিত্যিকের আর্টপ্লেট ছবি সহ—** লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, নবনীতা দেবসেন, অদ্রীশ বর্ধন, নলিনী দাশ, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জিল সেন-এর প্রথম প্রকাশিত গল্পের সংকলন।

***দুই দশকের নির্বাচিত কিশোর গল্প সংকলন**—১২·০০

*মঞ্জিল সেন (সত্যজিৎ রায়ের সম্পূর্ণ জীবনী) **অদ্বিতীয় সত্যজিৎ**—২০·০০

লীলা মজুমদারের অসাধারণ ভূমিকাসহ সত্যজিৎ রায়ের সচিত্র জীবনী, সমগ্র চিত্তকর্মের পর্যালোচনা, স্রষ্ঠা সত্যজিৎ, লেখক সত্যজিৎ, মানুষ সত্যজিৎ, ছবি তোলার ফাঁকে মজাদার ঘটনা, বিদেশীদের চোখে সত্যজিৎ —সম্পূর্ণ সত্যজিৎ।

অ্যালেস্টেয়ার ম্যাকলীন গানস্ অফ নাভারুণ—২০·০০

সুজিত নাগ (সম্পাদনায়) ৬ জন নামকরা সাহিত্যিকের গোয়েন্দা গল্প

গোয়েন্দা রহস্য গল্প—৬·০০

সুজিত নাগ (সম্পাদনায়) ৬ জন নামকরা সাহিত্যিকের ভূতের গল্প

কঙ্কালের টঙ্কার—৬·০০

সুজিত নাগ (সম্পাদনায়) নামকরা সাহিত্যিকদের রূপকথার সংকলন

চিরকালের রূপকথা—৭·০০

কৈফিয়ৎ

ছিল রুমাল, হ'য়ে গেল বেড়াল, যা ছিল ডিম, হয়ে গেল একটা প্যাঁকপেকে হাঁস—সুকুমার রায়ের জগতে এ ঘটনা আকছার ঘটলেও আমাদের, অর্থাৎ যাদের সবাই আধবুড়ো বলে মনে করে, তাদের জগতে খুব একটা বেশী ঘটে না। কিন্তু সেই আশ্চর্য ব্যাপারটাও ঘটল। আমিও লিখে ফেললাম।

ছিলাম পাঠক। বই পড়তে ভালো বাসতাম। সেই সূত্রে কলেজস্ট্রীট পাড়ায় যাতায়াত। অনেকের সাথেই পরিচয়।

এই ভাবেই এই বইএর প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ চন্দ্র মশাই-এর সাথে আলাপ। ক্রমে আলাপ গাঢ়তর। কোন নতুন বই বেরোলেই তা নিয়ে আলাপ, তর্ক। তারপর সওদা শেষ করে মাসের বাকী কটা দিন, কোন কোন আইটেমে একটু টেনে চালাতে হবে এইসব ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফেরা।

হঠাৎ একদিন চন্দ্রমশাই আমার বাড়ী এসে হাজির। সাথে প্রস্তাব—আপনি বই লিখুন। ভাবলাম অনেক দূর থেকে ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে এসেছেন, বোধ হয় শরীর-টাও ভালো নেই, তাই কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলেছেন। আমি লেখক? চেনা জানা চার পাঁচ জন লেখক থাকলেও, কোনদিন আমি নিজে এক কলম লিখব, আর তা ছাপাও হবে—কখনও ভাবিনি। অবশ্য বাঙালীদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আমিও মাঝে মাঝেই কলম হাতে নিয়ে মনে মনে মহাকাব্যের খসড়া বহুবার করেছি। তবে পরে সেসব কথা ভেবে বা আঁকিবুঁকি টানা সে সব রচনা পড়ে নিজেরই এত হাসি পেয়েছে যে তা আর বলার নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে সব কাগজ পুরোণ কাগজওয়ালার কাছে গিয়ে সংসার বাজেটের সেতুতে কাঠবেড়ালীর ভূমিকা পালন করেছে।

এদিকে রবিবাবুও নাছোড়বান্দা, চা, কফি খাওয়ালাম। নতুন বই নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম কিন্তু কিছুতেই ভবী ভুলবার নয়। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা, 'কে ছাপবে মশাই এই সব ছাই পাঁশ?' রবিবাবুর এক নিঃশ্বাসে উত্তর—'আমি ছাপব'।

বাঁদর নাচ দেখে আমরা সবাই প্রশংসা করি বাঁদরটার, কিন্তু মনে রাখি না যে এই খেলা দেখানোর সবটুকু কৃতিত্বই আসলে বাঁদরওয়ালার পাওনা। তেমনি এ' বইএর নিন্দা বা প্রশংসা—যাই কিছু হোক না কেন, তার একমাত্র অংশীদার রবিবাবু—এই বইএর প্রকাশক, ভদ্রলোক সত্যিই সাহসী বাঙালীদের মধ্যে একজন।

এই বইএর চিন্তাটা মনের ভেতর অনেকদিন ধরেই ছিল। N Sladkov-এর Planeta Chudiyes বইটা পড়ার সময় থেকেই। ১৯৭৭ সালে বইটা যখন প্রথম পড়ি তখন থেকেই ভাবতাম যে এই বইএর বাংলা অনুবাদ এক্ষুণি হওয়া দরকার। ১৯৮৪ সালে হাতে এ'ল পুরো এক সেট নতুন Encyclopedia Britanica, সুযোগ হ'ল আবার 'বিপুলা এ ধরিত্রীর' নানা অজানা খবর জানবার আর সাথে সাথে Sladkov-এর অনেকগুলো বক্তব্য আধুনিক গবেষণার আলোতে নতুন করে মিলিয়ে নেবার।

এই বই লিখবার মূল প্রেরণা Sladkov হ'লেও, এটা ওনার Planeta Chudiyes এর আক্ষরিক অনুবাদ নয়। টেনেটুনে ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। গল্পের খসড়া লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত। তাই মূল বইএর অনেক ঘটনা এতে অনুপস্থিত। প্রমাণ অংশে যোগ করা হয়েছে বেশ কিছু নতুন তত্ত্ব ও তথ্য। তার ওপরে কোন প্রামাণ্য (Reference) বইতে Sladkov এর বক্তব্যের সরাসরি প্রমাণ না পাওয়া গেলে—সে জাতীয় ঘটনা নির্দয়ভাবে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা সে ঘটনা যত রোমাঞ্চকর বলে মনে হোক না কেন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে লিখেছি। দু' একদিন রাত জেগেও, আমার বর্ত্তমান কাজে ছুটির সংখ্যা অত্যন্ত কম। কাজেই লিখতে সময় লেগেছে—সাধারণতঃ যা' লাগা উচিত তার ঢের বেশি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার? তা অবশ্য ভাবে সবাইকেই জানাচ্ছি। বাড়ীর সবাই, বন্ধু বান্ধব যাঁরা যেখানে আছেন প্রত্যেককেই এই সুযোগে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ চেনাজানা সবাই-ই কোন না কোনভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। কেউ এই লেখার সমালোচনা করে কেউ বা তাদের অনুপস্থিতি দিয়ে আমাকে লিখবার সময় করে দিয়ে। এদের মধ্যে একজন আমার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা সহজেই দাবী করতে পারেন। এই লেখার পেছনে তাঁর অবদান অনেক। তিনি এতটা চেষ্টা না করলে এত তাড়াতাড়ি আমি শেষ করতে পারতাম না। এই বইএর পেছনে তাঁর এতটা অবদান থাকা সত্বেও এটা যে শেষ পর্যন্ত শেষ করা গেল—এটাই আশ্চর্য।

এ বাড়ীতে আমার একজন কঠোর সমালোচক আছেন। আমি যা কিছুই করি না কেন উনি তা সব বেশ খুঁটিয়ে দেখেন আর যথাযোগ্য মন্তব্য করেন। কোন বিশেষ ব্যাপারে উনি এখন একটু ব্যস্ত তাই এই বইএর পাণ্ডুলিপি পড়ার সুযোগ তিনি পান নি। পড়লে বইএর পাঠকদের এই বই পড়ার যন্ত্রণা হয়ত পেতে হ'ত না। আমি যে শেষ পর্যন্ত এতটা লিখে উঠতে পেরেছি—এজন্য রবিবাবুর তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল প্রেসের সেই সব ভদ্রলোকদের জন্য যাঁরা আমার হাতের লেখার মর্ম্মোদ্ধার করে কম্পোজ করেছেন—আমার সাহায্য ছাড়াই।

আর পাঠক, তোমার জন্য কি? যদি বইটা ভালো বা খারাপ লাগে রবিবাবুকে জানিও। যদি কোন তথ্য বিকৃত বা অসত্য বলে মনে হয় অথবা যদি কোন নতুন তথ্য তোমার চোখে পড়ে অবশ্যই জানাবে—তবে এবার সোজা লেখককে।

অলমিতি
শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়

এইচ/১৮ নলিনী রঞ্জন এভিনিউ
নিউ আলিপুর
কলকাতা-৭০০০৫৪
১লা বৈশাখ, ১৩৯৪।

এতে আছে

কথা শুরু	...	১
হাঙ্গরের পিঠে	...	২
মজন্তালীর দেশ	...	৩
বৃষ্টি বৃষ্টি	...	৪
ভোরবেলায়	...	৬
পরের দিন	...	৬
শহরে	...	৮
গাছ গাছালি	...	১০
পাহাড় পথে	...	১১
কিন্নর কণ্ঠী গুগলী	...	১২
নতুন বাড়ী	...	১২
বুনো হাঁসের রাখাল	...	১৪
কাঠের গরু	...	১৫
পাখীর দুধ	...	১৫
চোর পুলিশ	...	১৬
আদালতে	...	১৭
'পাখীর খাঁচা' গাছ	...	১৮
জল বিনা মছ্‌লি	...	১৯
সমজদার ধান	...	২০
পয়সার ওজন	...	২২
একটি শিকারের কাহিনী	...	২৩
কুকুর রেণু	...	২৫
সাঁতারু হাতী	...	২৭
বৈষ্ণব নেকড়ে	...	৩০
আবার বনে	...	৩২
টৌনিদার গল্প	...	৩৪
মাৎস্যন্যায়	...	৩৬
আধুনিক সিন্ধবাদ	...	৩৭

ঢেউ এর 'পরে ঢেউ	...	৩৯
ডুবুরীর সাথে	...	৪১
সবুজ রক্ত	...	৪১
দাদাকথামৃত	...	৪৩
জলের 'পেলে'	...	৪৪
সাগর তলে	...	৪৫
পাহাড়ের গান	...	৪৬
ফুলের গোপন কথা	...	৪৮
বাহারে পালক	...	৪৯
আমার শিকার	...	৫০
মাছের ঝোল	...	৫১
পেরেক খোর পাখী	...	৫২
ভোজ কর যাহারে	...	৫৩
পোকার নামে স্মৃতি সৌধ	...	৫৫
সোনার মাছ	...	৫৭
তিমির পিঠে চাপড়	...	৫৮
শেষ কথা	...	৬০

প্রমাণ

পাতা ওল্টাবার আগে পাঠকের সাথে এক মিনিট	...	৬৫
দোমিনিক	...	৬৬
হাঙ্গরের পিঠে	...	৬৬
মজন্তালীর দেশ	...	৬৭
বৃষ্টি বৃষ্টি	...	৬৮
ভোরবেলায়	...	৬৯
পরের দিন	...	৭০
শহরে	...	৭২
গাছ গাছালি	...	৭৪
পাহাড় পথে	...	৭৬
কিন্নরকণ্ঠী গুগলী	...	৭৭
নতুন বাড়ী	...	৭৭

বুনো হাঁসের রাখাল	...	৮০
কাঠের গরু	...	৮১
পাখীর দুধ	...	৮২
চোর পুলিশ	...	৮৩
আদালতে	...	৮৪
‘পাখীর খাঁচা’ গাছ	...	৮৫
জল বিনা মছলি	...	৮৫
সমজদার ধান	...	৮৬
পয়সার ওজন	...	৮৬
একটি শিকারের কাহিনী	...	৮৮
কুকুর রেণু	...	৮৮
সাঁতারু হাতী	...	৮৮
বৈষ্ণব নেকড়ে	...	৯০
আবার বনে	...	৯১
টোনিদার গল্প	...	৯৩
মাৎস্যন্যায়	...	৯৫
আধুনিক সিন্ধবাদ	...	৯৬
ঢেউ এর ’পরে ঢেউ	...	৯৮
সবুজ রক্ত	...	৯৯
দাদাকথামৃত	...	১০০
জলের ‘পেলে’	...	১০১
সাগর তলে	...	১০২
পাহাড়ের গান	...	১০৫
ফুলের গোপন কথা	...	১০৭
বাহারে পালক	...	১০৭
আমার শিকার	...	১০৯
মাছের ঝোল	...	১০৯
পেরেক খোর পাখী	...	১১০
ভোজ কর বাহারে	...	১১০
পোকার নামে স্মৃতি সৌধ	...	১১৩
সোনার মাছ	...	১১৫
তিমির পিঠে চাপড়	...	১১৫

"কিছু কথা"

সম্প্রতি এক মহান ব্যক্তির জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করে, যে বিপুল উৎসাহ, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পেয়েছি, সেই থেকেই মনে আলোড়ন সৃষ্টি হয় যে, যা কিছু প্রকাশ করব তার মধ্যে যেন কিছু নতুনত্ব থাকে।

সেই সূত্রে মাননীয় তুষার চট্টোপাধ্যায়ের বিশাল লাইব্রেরীতে বসে আলোচনা ও যুক্তির ফাঁকে ফাঁকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চলে যায় সুসজ্জিত মূল্যবান বইগুলোর দিকে।

এইভাবেই একদিন N. Sladcov এর Planeta Caudiyes বইটির সঙ্গে পরিচিত হলাম।

বইটি সম্পূর্ণ আশ্চর্য ও সত্য ঘটণায় পরিপূর্ণ, সেই সঙ্গে প্রতিটি ঘটনার প্রমান ও লোভনীয় ছবিগুলো দেখে বিশেষ আকৃষ্ট হলাম।

বইটি সম্বন্ধে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের বিশদ আলোচনায় মনে হলো পৌঁছে গেলাম সেই সব দেশে এবং স্বচক্ষে দেখতে পেলাম সেই সব ঘটনাগুলো, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করে ফেললাম এই বই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করব।

বাংলা প্রকাশনা জগতের দুরাবস্থার চিন্তা-ভাবনা তলিয়ে গেল উক্ত বই এর বিষয় বৈচিত্রে।

আশা করছি এ বই পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করবে।

রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র

কথা শুরু

এসো, রামখুড়োর সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। তাঁর জবানীতেই যখন এই পুরো গল্পটা।

বয়েস চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, এককালে মোটা ছিলেন—এখন ডায়েবিটিসের ধাক্কায় সাধারণ চেহারা, চোখে মোটা চশমা, পরনে খদ্দরের হাফ পাঞ্জাবী আর পাজামা। গলা এমনিতে যত না ভারী, অচেনা লোক দেখলে তার তিন ডবল ভারী করে কথা বলেন, কোথায় এক লোহার দোকানে কি জানি কাজ করেন। কাকীমার ভয়েতে আমাদের বাড়ীতে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোমন্দ খান। খেতে ভালোবাসেন, আর ভালোবাসেন গল্প বলতে, গাঁজাখুড়ি মেশানো যতো রাজ্যের দেশভ্রমণের গল্প।

পুরো নাম রামনাথ রায়। ছেলে-বুড়ো সবার কাছেই উনি সমান তালে গল্প বলতে রাজি, কেবল একটি শর্তে। ওনার গল্প শুনে কেউ হাসতে পারবে না কিংবা মুখ ফসকে 'গুল' বা এই জাতীয় কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারবে না। তবু যদি কেউ ওনার গল্প শুনতে শুনতে ভুল করে 'গাঁজা' বা 'গুল' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে ফেলে তা হলেই খুড়ো ক্ষেপে যান। বলেন এই তো তোদের দোষ। যদি আজ আমি রামনাথ রায় না হয়ে রামনাথ বিশ্বাস হ'তাম, তা হলে আমার গল্প তো তোদের বিশ্বাস করতে কোন অসুবিধা হত না। তোরা কেন বুঝিস না যে আজকের এই জগতে যতগুলো শক্ত কাজ আছে, তাদের মধ্যে সবচাইতে শক্ত কাজ হচ্ছে ঠিক ঠিক 'গুল' দিয়ে যাওয়া, কারণ কাল যা ছিল অসম্ভব আর অবাস্তব—অর্থাৎ যাকে তোরা গুল বলিস, তা' আজ দিনের আলোর মতই সত্য। বাস্তব। যেমন ধর—

ওহো, বলতে ভুলে গেছি, খুড়োর দুটো নেশা। এক, নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানো আর দুই, যত রাজ্যের বই পড়া। তবে কোন ঘটনাটা তাঁর নিজের দেখা অভিজ্ঞতা, আর কোনটাই বা বই পড়ে জানা, তা উনি কিছুতেই বলতে চান না। সব কিছুই আত্মনেপদী ঢং-এ চালাবার চেষ্টা করেন।

খুড়ো বলে চলেন 'এই ধরনো আমার বন্ধু দোমিনিকের কথা, নিপাট ভালো মানুষ, কারুর সাতে পাঁচে কখনও থাকে না আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কথা বলে। কিন্তু বাবারা, ওর সাথে কখনও কেউ হ্যাণ্ডশেক করার চেষ্টা কোর না। একবার হাত মিলিয়েছ কি তুমি এমন এক ইলেকট্রিক শক খাবে যে একেবারে 'পপাত ধরণীতলে'। একদিন হয়েছে কি—দোমিনিক তো এক পুকুরের জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে যেই না এক-জন তার হাত বাড়িয়ে দোমিনিকের হাতটা ধরতে গেছে, অমনি দোমিনিকের গা থেকে

আগুনের ফুলকি বেরিয়ে এসে—লোকটার গায়ে আগুন-টাগুন লেগে—সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড। তারপর কেউই আর দোমিনিককে ছুঁতে চায় না—গায়ে আগুন লাগবার বা ইলেকট্রিক শক খাবার ভয়ে। শেষে আমিই হাতে রবারের দস্তানা এঁটে, রবারের চাদর দিয়ে ওর পুরো শরীর চাপা দিয়ে পুকুর থেকে ওকে উদ্ধার করি।'

শীতের দিন, ছুটির সকাল। রামকাকীমা বাপের বাড়ী গেছেন, কাজেই খুড়ো ত সকাল থেকেই আমাদের বাড়ীতে। আমাদেরও ক্লাস প্রমোশন হয়ে গেছে। বড়রা তাই আজ আর বেশী কিছু বলবেন না। সবাই মিলে খুড়োকে, তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত আর রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারে ভরা দেশভ্রমণের গল্পটা বলবার জন্য, চেপে ধরেছি। এক রাউণ্ড লুচি, আলুর দম, আর কফি হয়ে গেছে। প্রেশার কুকারে মাংস চেপেছে। গন্ধ আসছে। খুড়ো শুরু করলেন ঃ

হাঙ্গরের পিঠে

জাহাজে করে যাচ্ছিলাম। বই-এ ঠিক যেমনটি লেখা থাকে, তেমনি ঝড় হ'ল। জাহাজটাও নিয়ম মাফিক টুপ করে ডুবে গেল। আমি জলে পড়লাম।

নিয়মমাফিক সব কিছু মিলে যাওয়া সত্ত্বেও খুব যে একটা আনন্দ হয়নি, তা' ত বুঝতেই পারছিস্। চারিদিকে শুধু জল, ডাঙ্গার চিহ্ন মাত্র নেই। একটা নৌকো বা অন্য কোন জাহাজের ধোঁয়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। সাঁতার কাটার চেষ্টা করছি, কিন্তু কোন দিকে যে কাটি, তাও ছাই বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ দেখি কালচে রং-এর পাল মেলে একটা নৌকো আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আশায় আনন্দে আমিও ওর দিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাঁতার কাটতে শুরু করলাম। কিন্তু একি ? এটা তো নৌকো নয়। এ যে দেখছি একটা বিশাল হাঙ্গর। যা আমি নৌকোর পাল বলে ভেবেছিলাম—সেটা আসলে হাঙ্গরের পিঠের বিশাল কালো পাখনাটা। হাঙরটাও বোধ হয় আমাকে দেখবার আশা করেনি। সবুজ ড্যাবডেবে চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তোরা তো জানিস্ই আমার পকেটে সর্বদা একটা পেন্সিল কাটা ছুরি থাকে। সেটাকেই বাগিয়ে ধরলাম। অর্থাৎ কিনা যা থাকে বরাতে। মরতে যখন হবেই, তখন একটু বাঁচবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কি ! মনে মনে 'আমি ভয় করব না, ভয় করব না' গানটাও দু'লাইন গেয়ে নিলাম।

কিন্তু তাতে কি হবে ? একটা বিশাল হাঁ আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। হাঙ্গরের দাঁতের ভেতর যে সব ছোট ছোট ডোরাকাটা মাছ, ব্যাটার দাঁতের খড়কে কাঠির

কাজ করার জন্য লেগে থাকে সেগুলোকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হাঙ্গরের দাঁতে লেগে থাকা আমার শরীরের টুকরোগুলো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ধাঙ্গর মাছগুলোর ভোজের খাবার হবে—মনে করে একটু একটু কষ্টও হতে লাগল।

কেন জানি না, আমার কাছাকাছি এসেই হাঙ্গরটা হঠাৎ এক ডুব দিল। ওটা যখন আবার জলের ওপরে ভেসে উঠল—অবাক হয়ে দেখি যে আমি ওর পিঠের ওপর বসে। দু'হাত দিয়ে হাঙ্গরের পিঠের ডানাটাকে জাপটে ধরলাম।

হাঙ্গরটা আমাকে গ্রাহ্যও করল না। আমাকে পিঠে চাপিয়ে সোঁ সোঁ করে এগিয়ে চলল একবারও না ডুবে। মনে হচ্ছিল ঠিক যেন স্পিডবোটে বসে আছি। আমার ত বিশ্বাসই হচ্ছিল না বেঁচে আছি কি না! মনে মনে সাঁইতিরিশ-এর বর্গমূল বার করলাম, নিজের গালে চড় মারলাম, পায়ে চিমটি কাটলাম, ব্যথা লাগল। নাঃ জেগেই আছি।

বেশ খানিকটা চলার পর দূরে ডাঙ্গা দেখা দিল। কিন্তু হাঙ্গারটার বোধহয় এই ডাঙ্গার দৃশ্য ভালো লাগল না। অথবা, বুঝতে পারল ফ্রি টিকিটে অনেকখানি মজা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ডাঙ্গার কাছাকাছি গিয়ে ও আবার ভুস্ করে ডুবে গেল। কিন্তু ততক্ষণে আমি পায়ের নীচে মাটি পেয়ে গেছি। একটু সাঁতার কেটেই পাড়ে উঠে পড়লাম। হাঙ্গরটাকে ধন্যবাদ জানানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে ত আর আমার জন্য অপেক্ষা করেনি। আমাকে নিরাপদ করেই তলিয়ে গেছে জলের অতলে।

এক মাংস খেকো হাঙ্গর আমার প্রাণ বাঁচালো, সত্যিই এ এক অবাক করা অভিজ্ঞতা। তখন অবিশ্যি বুঝিনি আমার অবাক হওয়ার এই সবে শুরু।

মজন্তালীর দেশ

পাড়ে এসে ত পেঁছিলাম, কিন্তু কোথাও কোন গাছপালা, জীবজন্তু অথবা জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই। সব কিছুই কেমন যেন ন্যাড়া ন্যাড়া—প্রাণহীন বলে মনে হ'ল। কেবল পাড়ের বালিতে হাজারে হাজারে গর্ত।

এত সুন্দর ভদ্র ব্যবহার পাওয়ার জন্য, হাঙ্গরটার অভাবে আমার একটু একটু মন খারাপ যে করছিল না, তা বলব না তবে এটাও ঠিক, আমি হচ্ছি ডাঙ্গার মানুষ, আর ও জলের। বেশীক্ষণের জন্য একজন অন্যের বাড়ীতে থাকতে পারি না।

রাত গভীর হয়ে এল। একটা মস্ত ঝিনুককে বালিশ করে নরম বালির ওপরেই শুয়ে পড়লাম। আস্তে আস্তে চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে।

মাঝরাতে হঠাৎ বেশ জোর চেঁচামেচির আওয়াজ আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। মনে হ'ল যেন হাজার হাজার বেড়াল একসাথে কাজিয়া ঝগড়া করছে। আকাশে এক ফালি

চাঁদ। তারই আবছা আলোয় দেখলাম যে গর্ত থেকে, কালো কালো কি যেন সব জানোয়ারের দল বেড়িয়ে এসেছে। আবছা অন্ধকারে তাদের সবুজ চোখগুলি ঝক্ঝক্ করে জ্বলছে। জানোয়ারগুলো নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি করছে আর থেকে থেকে দৌড়ে দৌড়ে সাগরের জলের কাছে যাচ্ছে। পরে অন্ধকার খানিকটা চোখে সয়ে এলে বুঝতে পারলাম, যে ভাটার টানে জল অনেকটা দূরে সরে গেছে ডাঙ্গার ওপর যে মাছগুলো পড়ে রয়েছে, ওই জানোয়ারগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো ধরছে আর কচ্মচ্ শব্দ করে কাঁচা মাছ চিবোচ্ছে।

সারারাত ধরে চলল এদের এই চিৎকার, মাছ ধরার পাঠ আর তার সাথে মাঝে মাঝেই সবুজ চোখের ঝলকানি। কিন্তু যেই না ভোরের প্রথম আলো ফুটেছে, অমনি আবার কোথায় কে? পাড়ের ভিজে বালির ওপর খালি পড়ে রয়েছে, গতরাত্রির উৎসবের চিহ্ন হিসাবে বেশ কিছু মাছের কাঁটা আর বালির ওপরে অসংখ্য পায়ের ছাপ। গোল গোল পাঁচ আঙ্গুলে নখহীন পায়ের ছাপ। দেখলেই আর কোন সন্দেহ থাকে না যে এই ছাপগুলো আমাদের সবার পরিচিত বাঘের মাসীর পদচিহ্ন।

আমি কি অবশেষে মজন্তালীদের এক দেশে এসে পৌছলাম?

বৃষ্টি বৃষ্টি

এই সব অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে, আর নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমি নিজেতেই একটু মশগুল হয়ে পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে কখন আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছে আর সাথে সাথে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে—তা ঠিক খেয়াল করিনি। হঠাৎ গায়ে বৃষ্টির কয়েক ফোঁটা জলের সাথে শক্তমত কি যেন একটা গায়ে এসে পড়ল। চমকে চেয়ে দেখি —আরে, এ যে আকাশ থেকে মাছ পড়ছে। বলতে বলতেই বৃষ্টিটাও খুব চেপে এল। আর সেই বৃষ্টির সাথে খলসে, পুঁটি, পার্শে—অর্থাৎ যত না জল তার চাইতে বেশী মাছ বৃষ্টির মত ঝরতে লাগল আকাশ থেকে। চোখের সামনে পাড়ের সব কটা গর্তই এই আকাশ থেকে ঝরে পড়া মাছে ভর্তি।

বৃষ্টিজলের সাথে মাছ—এ দেখে গর্তের ভেতরে লুকোন বেড়ালগুলোও খুব খুশী। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে এই বৃষ্টির সাথে পড়া জ্যান্ত মাছ ধরে খেতে লাগল। মাছের সাথে যে জলও পড়ছে তা তারা গ্রাহ্যই করল না। ওদের লাফানো ঝাঁপানো আর গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল যে, এক্ষুনি ওরা সবাই মিলে 'আয় বৃষ্টি ঝেপে' গানটা গেয়ে উঠবে অথবা 'বৃষ্টি, যুগ যুগ জিও' ধরনের একটা হাঁক পেড়ে উঠবে।

জীবনে অনেক বৃষ্টি দেখেছি কিন্তু এ'রকম মাছ বৃষ্টি কখনও দেখিনি। এ' বৃষ্টিতে যেন মাছটাই আসল—সাথে যে জলের ফোঁটাগুলো পড়ছে তা যেন মাছের বৃষ্টির ভেজাল। এই সব দার্শনিক চিন্তা করছি হঠাৎ মনে পড়ল কাল সারাদিন ত'খাওয়া হয়নি। খেয়াল হ'ল প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, কিন্তু কি খাব ? খাবার বলতে ত এক এই বৃষ্টির মাছ। তাই কি আর করা, বেড়ালগুলোর সাথে মিলে মিশে আমিও সেই আকাশ থেকে পড়া কাঁচা মাছগুলো ধরে ধরে খেতে লাগলাম। কি বলব তোদের খিদের মুখে সেই কাঁচা মাছ যেন 'অমৃত সমান' মনে হল। তবে একটু নুন থাকলে বোধহয় আরও ভালো লাগত।

এর মধ্যে বৃষ্টিটা একটু ধরে ছিল, আবার তোড়ে শুরু হল। তবে এবার আর সাথে মাছ নয়—জলই। কিন্তু সে জল যেমন তেমন নয়, রঙীন জল। টুকটুকে লাল রং-এর বৃষ্টি পড়তে শুরু করল আকাশ থেকে।

একটা বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথেই ঠিক ম্যাজিকের মতই বৃষ্টির জলের রং ও বদলে গেল। এবার লাল বৃষ্টির রং হয়ে গেল দুধের মত সাদা। এই দুধ রং-এর জল, ভেজা মাটিতে পড়ে—সে যে কি সুন্দর দৃশ্য—তা আর তোদের কি বলব ? একটু আগেই লাল বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, আর এখন শাদা, ঠিক মনে হচ্ছে লাল জ্যামের তীর কেটে দুধের নদী বইছে।

মশগুল হয়ে এ দৃশ্য দেখছি এদিকে চারপাশের আবহাওয়াও আবার বদলে গেছে। এবারও আকাশে মেঘ আছে, আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে সেই মেঘের গা থেকে বৃষ্টির জল ঝরছে। কিন্তু সেই বৃষ্টির একফোঁটাও মাটিতে এসে পেঁছচ্ছে না। মাটি যেমন শুকনো ছিল তেমনি শুকনো রয়েছে।

খুব মজা লাগছিল এ'সব দেখতে, আচমকা গায়ের ওপর আবার একটা ঠাণ্ডা ভিজে আর কিলবিলে জিনিষ পড়ল। তাকিয়ে দেখি এবার আমার গায়ের ওপর একটা ব্যাং-এর বাচ্চা। আবার শুরু হল আকাশের ভেল্‌কী দেখানো। তবে এবার আর বাচ্চা ব্যাং নয়। ঝুড়ি ঝুড়ি বেশ ভালো সাইজের ব্যাং পড়তে লাগল আকাশ হতে—জলের ফোঁটার সাথে সাথে। মাছের সময়ে ঠিক যেমনটি হয়েছিল—তেমনি এবার আকাশ থেকে নেমে আসা ব্যাং দিয়ে পাড়ের গর্তগুলো আবার ভর্তি হয়ে গেল।

ভাবছিলাম, আমার সাথে একটা ছাতা থাকলে কি ভালোই না হত। ব্যাং বৃষ্টির সময় ব্যাং-এর হাত থেকে মাথা বাঁচানো, আর মাছ বৃষ্টির সময় ছাতা ভরা মাছ—দুটো কাজই করা যেত সেই ছাতাটা দিয়ে। কিন্তু তা ত আর হল না, ছাতা থাকলে দু-একটা আকাশী মাছ সেটাতে ভরে তোদের জন্যও নিয়ে আসতাম। সেই মাছ ভাজা খেলে বুঝতে পারতিস্‌ এ' মাছের কি স্বাদ !

ভোরবেলায়

ক্রমে সকাল হ'ল। আকাশ পরিষ্কার। চারধার উজ্জ্বল হয়ে উঠল সূর্যের আলোয়। একে একে, একটা ফিকে নীল, একটা গাঢ় নীল, আর একটা সবুজ রং-এর সূর্য উঠে পড়ল আকাশে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি ত হতবাক্। জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি—তা বুঝতে বুঝতে কখন যে দু'চোখের পাতা এক হয়ে গেছে, তা নিজেও জানি না।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন দেখি আকাশ আলোয় আলোময়। কিন্তু এ'কি? আকাশ ভরে রয়েছে একটা, দুটো তিনটে···না না সব মিলিয়ে আটখানা সূর্যতে। তবে এ সব সূর্যের আলো আর রং আমাদের দেশের সূর্যের মতনই।

মাত্র একটা সূর্য আকাশে দেখে অভ্যস্ত – এই দেশের লোক আমি, একসাথে এতগুলো সূর্য সহ্য করাও আমার পক্ষে একটু কষ্টকর। কাছাকাছি একটা গুহা মত খুঁজে বার করলাম। গুহায় গিয়ে যেই শুয়েছি— আবার ঘুম।

এবারে ঘুম ভাঙ্গল সেই বিকেলবেলায়। নিজের চোখের সামনে, একে একে আটখানা সূর্যকে সমুদ্রের দিগন্তে ডুবে যেতে দেখলাম। আর ঘন নীল সে সূর্যাস্তে কি আভা। যেন এক পুরো দোয়াত নীল কালি কেউ উবুড় করে দিয়েছে পৃথিবীর বুকে।

পরের দিন

গতকাল এত সব কিছু দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। ঘুম ভাঙ্গল সকালবেলা। আলো ঝলমলে সকাল।

একটু হাটাহাটি শুরু করলাম। আবার নতুন কিছু যদি দেখতে পাই তার আশায়। সাগরের পাড় ধরে ভেতরের দিকে একটু এগোতেই একটা বন। আর সেই বনের ভেতর গিয়ে আমার যা প্রথম চোখে পড়ল তা' হচ্ছে একটা নাক—মানুষের নাক। গাছের আড়াল থেকে বেড়িয়ে আছে। এতক্ষণ পরে একটা মানুষের দেখা পেয়ে মনটা যে কি রকম আনন্দে ভরে উঠল তা তোদের বলে বোঝাতে পারব না। যাক্ বাবা, এবার তবে সভ্যতার কাছাকাছি এসে পেঁছেছি। মানুষ যখন এখানে আছে তা হলে তারা সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করার জন্য নিশ্চয়ই নৌকো জাতীয় কোন কিছুর সাহায্য নেয়। আর এরা যদি দয়া করে আমাকে এদের একটা নৌকো দিয়ে দেয়, তবে হয়ত আমার বাড়ীতে ফিরবার একটা সম্ভাবনা হলেও হতে পারে। এই সব ভাবতে ভাবতে যে গাছটার পেছনে সেই মানুষের নাক দেখেছিলাম—তার দিকে এগোলাম।

আমাকে এগোতে দেখে ঐ মানুষটাও গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। প্রথমে

দেখলাম ওর মুখটা। কান, নাক, চোখ—সবই আমাদের মত। তারপর বেরোল ওর ধড়। এ কি রে বাবা! এর গলাটা যে জিরাফের মত লম্বা। ধড় থেকে প্রায় চারশ মিলিমিটার দূরে ওর মাথাটা, দেহের সাথে একটা মোটা নলের মত গলা দিয়ে জোড়া। শরীর থেকে অতটা ওপরে মাথাটা থাকায়, সর্বদাই একটু লগ্‌বগ্‌ করছে মাথাটা।

ক্রমশঃ দেখলাম লোকটা একা নয়, সাথে আরও অনেক লোক আছে। আস্তে আস্তে আমার চারপাশে একটা বেশ ভালোমত ভীড় জমে গেল। সবাই-ই আমাদের মত মানুষ, কেবল ওদের লম্বা গলাটার জন্যই বোধহয় কেমন জানি মনে হয়। ভীড়েতে যে মেয়েরা ছিল—আমাকে দেখে তাদের কি হাসি। যেন আমি একটা অদ্ভুত দর্শন জীব। ওদের কাছে বোধহয় লম্বা গলা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। মিথ্যে বলব না, চারপাশে এত-গুলো চারশ মিলিমিটার গলার ভীড়ের মধ্যে আমার নিজের ষাট মিলিমিটার গলার জন্য নিশ্চয়ই একটু লজ্জা লজ্জা করছিল।

মেয়েদের হাসাহাসি দেখে আমার খানিকটা সাহস বাড়ল। আমি হ্যাণ্ডশেকের ভঙ্গিতে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। অমনি ওরা মুখটাকে উঁচু করে তাদের নাকটা বাড়িয়ে ধরল। বুঝলাম, আমরা যেমন হাতে হাত মিলিয়ে বন্ধুত্ব পাতাই, ওরাও তেমনি নাকে নাক ঠেকিয়ে আলাপ শুরু করে। তাই-ই করলাম। ঐ যে কথায় আছে না 'যস্মিনদেশে···।'

আগেই বলেছি, একটু ভয় ভয় করলেও এই লোকগুলোকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল। কাজেই সবার সাথে নাক ঘষার পর, ওরা যখন আমাকে ওদের সাথে যেতে ইঙ্গিত করল—আর দ্বিধা না করে আমিও রওয়ানা দিলাম। লম্বা গলার জন্যই কি না জানি না লোকগুলো হাঁটে একটু আস্তে আস্তে। তবে এরা লোক খুব ভালো, আমাকে বেশ যত্ন করে সাথে নিয়ে চলল।

চলতে চলতে আমরা একটা নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। আমিও কান খাড়া রেখে ওদের কথাবার্তা একটু একটু করে বুঝবার চেষ্টা করছি। হঠাৎ দেখি আমাদের দলের একজন নদীর তীরে উবু হয়ে বসে, পাড়ে যে সব ঝোপঝাড় আছে সেগুলোকে খোঁচা দিচ্ছে। আর তাকে ঘিরে একটা ছোট-খাট জটলা। কি ব্যাপার, বুঝবার জন্যে এগিয়ে গেলাম।

কাছে গিয়ে দেখি লোকটা আর ওর দলের সাথীরা মিলে ঐ ঝোপ থেকে তিনটে বড় বড় মাকড়সা ধরেছে আর বুঝলাম এই মাকড়সা নিয়েই এদের আলোচনা চলছে। দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে ঐ তিনটে মাকড়সা তিনটে বড় বড় জাল বুনে ফেলল। আর তা দেখে সবাই কি খুশী।

যেইনা জাল বোনা শেষ, অমনি দলের মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে লেগে পড়ল কাজে। মাকড়সা গুলো তাড়িয়ে দিয়ে একজন সেই জাল দিয়ে বানালো একটা গোল মত জিনিষ। অনেকটা ছোট মাছ ধরার জন্যে যে ধরণের গোল গোল জাল আমাদের দেশের জেলেরা ব্যবহার করে, সেই রকম। আর একটি মেয়ে দ্বিতীয় মাকড়সার জাল দিয়ে বানালো একটা জামা। সব চাইতে দেখতে সুন্দর আর অল্প বয়েসী মেয়েটি শেষ জালটাকে ক্যানভাস করে তারওপর আঁকল আমার ছবি। পাখীর পালক দিয়ে তৈরী তুলিতে আঁকা আমার সেই ছবি—সে যে কি জীবন্ত আর সুন্দর—তা ভাষায় বলে বোঝানো যায় না।

সঙ্গের লোকেদের হাবভাবে বুঝলাম এরা আমাকে জামাটাও উপহার দিচ্ছে। আমিও মাকড়সার জালে বোনা জামাটা চটপট পড়ে নিলাম। এত নরম আর সুন্দর সেই জামাটা! এদিকে আমার দলের লোকেরা মাকড়সার জাল দিয়ে বানানো মাছ ধরার জালে নদী থেকে অনেকগুলো নীল রং-এর মাছ ধরে ফেলেছে। নদীর পাড়ে উনুন জ্বলে উঠেছে। মাছভাজাগুলো খেতেও চমৎকার।

বিকেল নাগাদ শহরে এসে পেঁাছলাম, একটা বাড়ীর সামনে আমাকে দাঁড় করালো। বুঝলাম, যতদিন না দেশে ফিরে যাবার কোন উপায় হয় এই বাড়ীতেই আমায় থাকতে হবে।

দিনের শেষ হতে এখনও বেশ খানিকটা বাকী। ভাবলাম এদের শহরটা একটু ঘুরেই দেখা যাক না কেন।

শহরে

শহরটা এমনিতে আমাদের দেশেরই মত। বড় বড় রাস্তা, দোকান পাট, লোকজন, সবই ঠিকঠাক আছে, কেবল বাড়ীগুলিই যা কাগজ দিয়ে তৈরী। হ্যাঁ কাগজ। কাগজের দেয়াল, কাগজের দরজা-জানালা, কাগজের ছাদ, এমনকি বাড়ীর মেঝে আর সিঁড়িগুলোও কাগজ দিয়ে তৈরী।

রাস্তায় বেশ লোক, মেয়েরা সবাই বেশ গয়নাগাটি পরা। তাদের অন্যান্য গয়না তবু যা হোক যেমন তেমন, অর্থাৎ চেনা জানা, তবে সত্যিই অবাক করা গয়ণা হচ্ছে ওদের কাণের দুল গুলো। দুকাণে ঝোলানো দুটো গোল গোল কাঁচের বাটি, তার মধ্যে জল ভরা আর সেই জলের মধ্যে জ্যান্ত মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঠিক যেন—ঐ যে এ্যাকুরিয়াম না কি যেন বলে—তারই দু'টো দু' কানে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে।

এই জ্যান্ত মাছ ভর্ত্তি দুল দেখে আমি ত হাঁ হয়ে গেছি, হঠাৎ পেছনে একটা ধাক্কা খেলুম। চারপাশে চেয়ে দেখি মেয়েদের গয়না দেখতে দেখতে, আর ওদের পেছন চলতে

চলতে আমি কখন একটা বাজারে এসে পেঁছেছি। বাজারে অনেক লোক। একটা রাখাল কতগুলো গাধা নিয়ে চলেছে রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে।

আমার জীবনে আমি চারপেয়ে আর দু'পেয়ে অনেক রকম গাধা দেখেছি, তবে এ'রকম ফুলপ্যাণ্ট পরা চার পেয়ে গাধা কখনও দেখিনি। সামনের ফুলপ্যাণ্টে একজোড়া পা' ঢেকেছে, আর পেছনের ফুলপ্যাণ্ট, পেছনের পা' জোড়ার জন্য। ফুলপ্যাণ্টগুলো আবার দু রকম ডিজাইনের। কোন গাধার সামনের ফুলপ্যাণ্ট ডোরাকাটা পেছনেরটা বুটিদার আবার কারুর বা এর উল্টোটা।

একটা ফিরিওয়ালা আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, কলকাতায় যেমন পাখীওয়ালারা কাঁধের ওপরে লম্বা বাঁশের দু পাশে খাঁচা ঝুলিয়ে পাখী বিক্রি করে বেড়ায় ঠিক তেমনি। খাঁচার ভেতরের আওয়াজ শুনে প্রথমে ভেবেছিলাম বোধহয় নতুন রকমের পাখীটাখী আছে। শেষে ভালো করে ঠাহর করে বুঝলাম যে খাঁচাতে পাখী নেই, খাঁচাগুলো শুধু পোকামাকড়ে ভরা। এই পোকার আওয়াজকেই আমি পাখীর আওয়াজ বলে মনে করেছিলাম। আমার চোখের সামনেই একটি লোক দু খাঁচা ভর্ত্তি ঐ পোকা কিনে নিল।

বাড়ী ফিরব বলে পেছন ফিরেছি। সামনে দেখি একটা মস্ত বড় সাইনবোর্ড আর তাতে ছবি দিয়ে সব কি লেখা রয়েছে। ছবিগুলো ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝলাম যে এটা এক ডেণ্টিষ্ট বা দাঁতের ডাক্তারের দোকান। দরজার সামনে একটি লোক লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের সামনে রোগীর দলের বেশ বড় সড় লাইন। রোগীদের চোখ ছল ছল, কারুর কারুর মুখ আবার চাদর দিয়ে ঢাকা, থেকে থেকে মুখ তুলে তারা দেখছে যে তার ডাক আসতে আর কত বাকী ? সাথে সাথে হাম্বা হাম্বা ডাক ছেড়ে জানাচ্ছে 'ওহে আর কত দেরী ? একটু তাড়াতাড়ি কর, আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে'। যেই ভেতর থেকে একটা গরু বেড়িয়ে আসছে দারোয়ান লাঠি দিয়ে অমনি লাইনের সামনের গরুটাকে ভেতরে পাঠাচ্ছে। ডাক্তারের কাছ থেকে যে গরুগুলো বেরিয়ে আসছে তাদের ল্যাজ নাড়া দেখলেই বোঝা যায় যে তাদের আর দাঁতের ব্যথা নেই।—ডাক্তার বাবু ভালো করে দিয়েছেন। বুঝলাম ডাক্তার ভদ্রলোক মানুষের নন, গরুর ডেণ্টিষ্ট। একটা দাঁত ভালো হয়ে যাওয়া গরু দেখলাম। ঠিক মানুষের মতই ওর দাঁত বাঁধানো, তবে সোনা দিয়ে নয়, লোহার দাঁত। পরে জেনেছি ডেণ্টিষ্ট ভদ্রলোকের হাত যশ আছে, ওঁর চিকিৎসায় গরুগুলো এত খুশী যে বাঁধানো দাঁত পেলেই তারা অনেক বেশী বেশী করে দুধ দিতে শুরু করে।

সারাদিনের হাঁটাচলার ক্লান্তির ওপরে এই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার চাপ আমার মাথা

এত ভার করে দিয়েছিল যে রাতে বাড়ী ফিরে যখন ঘুমাতে গেলাম, লক্ষ্য করে দেখি যে আমি সকলের চেয়ে লম্বায় প্রায় একশ মিলিমিটার বেঁটে হয়ে গেছি।

গাছ-গাছালি

বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে, গায়ের ব্যথাও আর নেই, লম্বা গলা লোকেদের অনেকের সাথেই আলাপ হয়েছে। এখন ওদের কথা আমি বেশ খানিকটা বুঝতে পারি।

আমাদের এই শহরটার পাশেই পাহাড়। একটা নয় পর পর অনেকগুলো, তোরা ত' জানিসই আমি পাহাড় একটু বেশী পছন্দ করি। ভাবলাম কাছের পাহাড়টাই একটু চড়ে দেখা যাক না কেন একদিন।

শুভস্য শীঘ্রম্। দু একদিন পরেই সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে পথে পড়ল একটা বেশ বড় সড় বন। বনটা দেখা মাত্রই আমার মনটা, কি জানি কেন, এক নতুন কিছু দেখবার আশায় গুর গুর করে উঠল। মনে হল গত কয়েকদিন ধরে এত অজানা নতুন জিনিষ সব দেখেছি। আর এই বন কি আমাকে নতুন কোন রহস্যের ঠিকানা জানাবে না?

আমাকে হতাশ হ'তে হয় নি। বনের অধিকাংশ গাছই আমাদের চেনা জানা গাছেদের থেকে একটু আলাদা। অর্থাৎ, এদের গুড়ি বা কাণ্ড—আমাদের পরিচিত গাছেদের মত গোল গোল নয়—একেবারে চৌকো, প্রথম দেখলে মনে হয় যেন কোন ভালো কাঠের মিস্ত্রী এই গাছগুলো ডালপালা শুদ্ধ তুলে নিয়ে, এদের চার পাশ খুব ভালো করে চেঁছে চৌকো চৌকো করে, আবার এগুলোকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু এ'টা যে সম্ভব নয়, সে কথাটা বুঝবার মত মনের অবস্থা তখনও আমার ছিল। দেখলাম চৌকো গাছের গুড়ির ওপর ছাল পরানো—চেঁছে ফেললে ত আর ছাল থাকবে না। চৌকো শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে বিশাল গাছ সব দাঁড়িয়ে আছে। কি যে তাদের পাতার বাহার। পাতা নড়ার ঝির ঝির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—ঠিক আমাদের দেশের গাছের মত আওয়াজ।

এই চৌকো গাছ দেখতে দেখতে কখন অজান্তে সঙ্গের ছুরিটা দিয়ে এই গাছের একটা ডাল কেটে ফেলেছি। আমাদের দেশের গাছ কাটলে পরে কাটা জায়গাটার ভেতরে যেমন সব গোল গোল দাগ দেখতে পাওয়া যায়—বুঝলি না, আরে, সেই রকম গোল দাগ, যা' দেখে লোকে গাছের বয়স বুঝতে পারে—এই গাছ গুলোর ভেতরেও ঠিক তেমনি। তফাৎ কেবল এ গাছের ভেতরের দাগগুলো গোল নয়—প্রায় বর্গক্ষেত্রের মত চৌকো;

চৌকো গাছের কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক হয়ে এগিয়ে চলেছি। পথে পড়ল আর একটা গাছ। আর আমিও থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

হ্যাঁ, শুধু একটা মাত্র গাছই আমাকে যে শুধু দাঁড় করিয়ে দিল তাই-ই নয়, এই গাছটির কাছে আমি প্রায় এক ঘণ্টা কাটালাম। একটি গাছ তার ছ' হাজার গুঁড়ি নিয়ে রাজার মত একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে মনে হল এ গাছের তলায় হাজার লোক সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে।

এ রকম একটা গাছ আমাদের দেশে থাকলে ত সভা সমিতির জন্য প্যাণ্ডেল বানানোর কোন প্রয়োজনই হয় না।

বনের ভেতরে বেশ খানিকটা সময় আনন্দে কেটে গেলেও আমাকে যেতে হবে পাহাড়ে। কাজেই এবার আর অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা পাহাড় বরাবর রওনা দিলাম।

পাহাড় পথে

পাহাড় চূড়ায় পেঁছিতে খুব একটা কষ্ট হ'ল না। ওপর থেকে নীচের শহর ছবির মত লাগছে। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ। একটু হাওয়া দিচ্ছে! মনের আনন্দে 'আজি জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' গানটার প্রায় পুরো এক স্তবক গেয়ে ফেললাম।

প্রাকৃতিক শোভা দেখার এই একটা বড় অসুবিধা যে তা পায়ের নীচের জমির কথা একদম ভুলিয়ে দেয়। আচমকা একটা ছোট গর্তে পড়ে গিয়ে পা'টা মচকে গেল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। এদিকে আসবার সময় শহরের কাউকেও বলে আসিনি যে আমি কোথায় যাচ্ছি। যদি কোন রকমে পাহাড় থেকে নামতেও পারি তবুও নামতে নামতে ত রাত হয়ে যাবে। এই রাত্তির বেলা এতটা পথ হেঁটে শহরে আমার বাড়ীতে পেঁছাইবো বা কিভাবে? এটা যদি আরব্য উপন্যাসের সময় হত তা হলে কি ভালোই না হ'ত? একটা পরী, নিদেনপক্ষে একটা দৈত্য, হুকুম করলেই ত আমাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একদম বাড়ী পেঁছে দিত। হাঁটতেও হ'ত না, কোন কষ্ট করতেও হ'ত না।

পায়ের ব্যথা কমাবার জন্য এই সব আবোল তাবোল চিন্তা করতে শুরু করলাম। পাহাড়টাও বোধ হয় আমার মনের কথা শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ দেখি পাহাড়টা গা ঝাড়া দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে শুরু করেছে। ভয়ে আতঙ্কে আমার চুল সজারুর কাঁটা।

খুব একটা জোরে না হলেও পাহাড় আমাকে নিয়ে শহরের দিকে এগোতে লাগল। পুরো সাতদিন ধরে সমানে চলল তার এই হাঁটা। অতবড় শরীর তাই বোধ হয় খুব

তাড়াতাড়ি যেতে পারছিল না। তবে সে তার হাঁটা থামায়নি একবারের জন্যও। সাত দিন পরে পাহাড়টা, জিরোবার জন্যই বোধহয়, যেই একটু থেমেছে, আমিও অমনি পায়ের ব্যথা-ট্যাথা ভুলে পাহাড় থেকে নেমে শহরের দিকে দে দৌড়, এই সাতদিন আমি খাইনি, ঘুমাইনি—কিচ্ছুটি করি নি। কেবল যত জানা অজানা ঠাকুর দেবতা আর জিন, পরী, দৈত্যকে চিনতুম, সকলের কাছে প্রার্থনা করেছি—নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

শহরের লোকেরাও আমাকে খোঁজাখুজি করছিল। আমি ফিরে আসতেই আমাকে ঘিরে ধরে নানান কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। কেবল যেই বলেছি আমার পাহাড়ের সাথে অ্যাডভেঞ্চারের কথা, সবাই এমন ভাবে হেসে উঠল যে আমি একটু বোকাই বনে গেলুম। যেন এ খবর সবার জানা, অথবা এ এক বহু পুরোন খবর। আমি যেন কেবল তাতে খানিকটা রং চড়িয়েছি। এদের হাবভাবে মনে হল পাহাড়ের চলাফেরা যেন কোন ঘটনাই নয়। রোজই এমন ঘটে।

কিন্নর কণ্ঠী গুগলী

আগেই বলেছি যে শহরের লোকেদের সাথে আমার এখন বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। এই সব নতুন বন্ধুদের মধ্যে সবচাইতে আমার ভালো লাগত একটা দশ এগারো বছরের ছেলেকে। সে প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসত, আর আমি ওর কাছ থেকে ওদের ভাষা শেখবার চেষ্টা করতাম।

সেই ছেলেটা একদিন আমাকে একটা উপহার দিল, প্যাকেটে বাঁধা। প্যাকেট খুলে দেখি, ভেতরে একটি গুগলী। এ আবার কি রকমের উপহার! ছেলেটাও বোধহয় আমার মুখদেখে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। ও তাই নিজের থেকেই বলল, 'এটা গায়িকা গুগলী, তোমাকে গান শোনাবে।'

সেই থেকে এই গায়িকা, যতদিন আমি ওদেশে ছিলাম, আমার সঙ্গী ছিলেন। তবে গায়িকার মেজাজটা একটু চড়া, বাইরে বৃষ্টি না পড়লে ওনার গানের 'মুড' আসে না। তবে যখন গান শুরু করত, তখন আমি যে একা একা এই পৃথিবীছাড়া জায়গায় পড়ে রয়েছি—সব দুঃখই ভুলে যেতাম।

নতুন বাড়ী

কাগজের বাড়ীতে থাকতে থাকতে হাঁপ ধরে গিয়েছিল। কখন দেয়াল ছিঁড়ে যায়, কখনই বা ঘরের মেঝে ফুটো হয়ে পড়ে, সারাক্ষণই প্রায় সন্ত্রস্ত থাকতে হত। শেষে আর থাকতে না পেরে বন্ধুদের আমার এই অসুবিধার কথা খুলে বললাম। তারাও দু'একদিনের মধ্যেই একটা মাটি দিয়ে তৈরী বাড়ীর খোঁজ এনে আমাকে জানালো।

তবে একটা কথা। ঐ বাড়ীটা মানুষের তৈরী নয়—এ বাড়ীটা তৈরী করেছে এক ধরণের পোকা। এখানকার সব মাটির বাড়ীই না কি এই পোকাদের হাতে তৈরী।

বাড়ীটা দেখা হল। আমাদের দেশের দোতালা সমান বাড়ীর মত উচু। দেয়ালগুলো পুরু ও শক্ত। দেখতে অনেকটা দুর্গের মত।

তবে বেশ কয়েকটা অসুবিধাও আছে। যেমন ধর,বাড়ীটার দরজা জানালা বলতে কিছুই নেই। আমার বন্ধুরা এ ব্যাপারটা বুঝতে পারার সাথে সাথেই বাড়ীর দেওয়ালে একটা দরজা ফুটিয়ে দিল, দেওয়ালটা কুড়াল দিয়ে কেটে। আর অন্যতম দ্বিতীয় অসুবিধা, বাড়ীর ভেতরটা ছিল, একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বন্ধুরা যখন ঘর সাজাবার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নিল তখন এ সমস্যারও সমাধান মিলল—ঘর হয়ে উঠল আলোময়। একটা প্রায় পাঁচিশ মিলিমিটার লম্বা ছাতা বসানো হল আমার ঘরে। তার মাথাটা হ'ল আমার টেবিল। অতি সাধারণ ব্যাং এর ছাতা—কেবল রাত্তিরবেলা তার থেকে এত আলো বের হয় যে বই-টই থাকলে তা স্বচ্ছন্দে পড়া যেত।

বাড়ীতে মশা-মাছি, পোকা-মাকড়, কোন কিছুরই বিশেষ উপদ্রব নেই। তবে জায়গাটা বনের কাছে—ইদুঁর, ছুঁচো আসতে পারে। এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য একজন একটি ময়াল সাপ নিয়ে এসে দিল আমার বাড়ীর ভেতর ছেড়ে। সাপটা বেশ বড় সড় আর কি যে সুন্দর দেখতে। আমার তো ওর ওপরে বেশ খানিকটা মায়াই পড়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের কাছে পরে শুনেছি এদেশের বহু লোক বাড়ীতে বেড়াল না পুষে সাপ পোষে ইদুঁরের হাত থেকে বাঁচবার জন্য।

অপর এক বন্ধু আর একদিন আমাকে উপহার দিল কয়েকটা টবে বসানো গাছ। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়ত এই গাছে নতুন ধরনের সুন্দর সুন্দর ফুল হবে তাই ও এগুলো আমাকে উপহার দিল। তারপর দেখি ওমা, তা ত নয়। এই গাছগুলো টপাটপ করে যত রাজ্যের মাছি মশা ধরে আর তাদের আস্ত গিলে খায়। গিলে ফেলার খানিক পরে, ঠিক আমরা যেমন কাঁটার ছিবড়ে ফেলে দেই, এই গাছগুলোও তেমনি এই গিলে ফেলা পোকাদের হাত-পা আর ডানার ছিবড়ে, নীচের মাটিতে ফেলে দেয়।

আমাদের দেশে কুকুর বাড়ী পাহারা দেয়—এই খবর শুনে এক বন্ধু নিয়ে এল এক কুকুর। এ ঘোর নিরামিশাষী কুকুর। মাছ খাবে না, মাংস খাবে না—কেবল ফল খাবে। শিকারে যাবারও কোন উৎসাহ নেই। কোনদিন আমার সাথে কোথাও যায় নি। অবিশ্যি এর আসল কারণ হল বেচারা ভালো করে হাঁটতেই পারত না। তবে তোরা যদি ওর ওড়া দেখতিস্ ! ডানা মেলে কখনও এ গাছে কখনও ও গাছে, যখন কুকুরটা উড়ে উড়ে বেড়াতো আমার ত দেখতে বেশ ভালোই লাগত। দিনের বেলা

অধিকাংশ সময়ই ও কাটাতো আমার ঘরের ভেতর। বাড়ীর দরজা ধরে মাথা নীচু করে ঝুলে রয়েছে। কিন্তু রাত্তির হলেই একেবারে বাড়ীর ছাতে বা কোন গাছের ওপর। তবে কোন চেচাঁমেচি করা বা কাউকে কামড়ানো—এ সব বদ অভ্যাস ওর একদম ছিল না। তার ওপরে ব্যাটার সুরতখানি যা ছিল না—চোরের সাধ্য কি যে আমার বাড়ীর কাছে ঘেঁষে? তার ওপরে আমার কুকুর হল উড়ন্ত কুকুর।

বুনো হাঁসের রাখাল

আমার বাড়ীটা যেখানে, তার পাশে ছিল একটি বেশ বড় মাঠ। এই মাঠে রাখালরা আসত তাদের পশু চরাতে। আমারও কোন কাজ ছিল না, তাই বসে বসে ওদের সাথে আলাপ করতাম।

একদিন শরৎকালের গোড়াতে, হঠাৎ কানে এ'ল এরোপ্লেনের আওয়াজ। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি একদল বুনো হাঁস উড়ছে আর তার ঠিক পেছনে উড়ছে একটি ছোট এরোপ্লেন। মাঠের এক রাখাল বন্ধুকে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে এরোপ্লেনে করে এক রাখাল তার বুনো হাঁসের দল চরিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনিতে হাঁসের দল এরোপ্লেনের সামনে উড়ছে, কিন্তু আকাশে কোন বাজ বা ঈগল পাখীর দেখা পাওয়া মাত্রই ঐ পাইলট রাখাল তার এরোপ্লেন দিয়ে হাঁসের দলকে আড়াল করে নিজে সামনে এগিয়ে আসবে। নীচের মাটিতে লুকিয়ে থাকা কোন পাখীমারা চোরা শিকারী এই হাঁসের দলের দিকে তার বন্দুক তুলেছে—এই দৃশ্য দেখতে পেলেও এরোপ্লেনের রাখাল তার হাঁসের দলকে এমনি ভাবেই আড়াল করে রাখবে।

এক বছরে দু'বার এই পাইলট রাখালকে দেখেছি। একবার সেই শরৎকালের গোড়ায়, আর একবার শীতের শেষে, বসন্তের শুরুতে। ওখানকার লোকেরাও এই পাইলট রাখালের আসা যাওয়া দেখে ওখাদকার আবহাওয়া আর বসন্তের আরম্ভের সময় গোনা শুরু করে।

পৃথিবীর অন্য সব দেশের মতই এ দেশেও বুনো হাঁস মারা আইনতঃ নিষিদ্ধ। একবার এক চোরা পাখী শিকারী হাঁস শিকার করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল। ঐ পাইলট রাখালই প্রথম ঐ চোরকে দেখতে পায়, আর সাথে সাথে নীচের পুলিশকে চুরির খবর পাঠায়। তখন সবাই মিলে দৌড়ে গিয়ে চোরটাকে ধরে। তারপর সবার কি রাগ ওর ওপর। এই মারে ত ঐ মারে। শেষে চোরটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল। শুনলাম ব্যাটার না কি অনেক দিনের জন্য জেল হয়েছে।

কাঠের গরু

যাদের বাড়ীতে গরু বা মোষ আছে তারাই শুধু জানে যে এই গরু মোষের পেছনে কতটা খিদমত করতে হয়। নিয়মিত চরানো চাই, দেখ, যেন আবার হারিয়ে না যায়, শেয়াল কুকুর যেন কামড়ে না দেয়। এর ওপরে সবচেয়ে বড় বিপদ হ'ল মড়ক লেগে যাওয়া। আমাদের এই দেশে অবিশ্যি ঐ রকম কোন ঝামেলাই নেই। কারন এখানকার গরুগুলির অধিকাংশই কাঠ—থুড়ি, গাছ দিয়ে তৈরী।

এখানকার লোকেরা দুধ খেতে ভালোবাসে, আর তারা এক বন গরু—আরে কি সব বাজে কথা বলছি—এক বন জুড়ে এই গরু গাছের চাষ করে। প্রতিদিন সকালে গোয়ালা বালতি হাতে করে গোয়ালে না গিয়ে বনে ঢুকছে, আর গোরু মোষের বদলে একটা গাছ থেকে দুধ দুইতে বসেছে—এ দৃশ্য যদি কারুর দেখতে হয়, তা হলে তার মাথাটাও যে, একটু গোলমালে হয়ে পড়বে—এতে আর আশ্চর্য্যের কি ?

গাছ-গরুগুলো সারাবছর ধরেই খুব টাটকা দুধ দেয়। দিনে বা রাতে যখন চাও, দুধ তৈরী।

এই গরু কখনও পালিয়েও যায় না, এদের ঠিক সময়ে খাবার দেবার ঝামেলাও নেই। ঘাস জল খাওয়াবার জন্য নিয়মিত চরানো—আর সেই চরানোর জন্য রাখাল—কিছুই এদের জন্য লাগে না। এমন কি একটা গোয়ালের পর্যন্ত প্রয়োজন এদের নেই। কুকুর শেয়াল কামড়ে মরক লাগিয়ে দেবে—তারও কোন ভয় নেই। তবে মাঝে মাঝে এদের গায়ে পোকা লাগে—আর এটাই এদের সবচাইতে বড় অসুখ। কিন্তু কোন চিন্তা নেই। এই অসুখেরও ওষুধ তৈরী। কি ওসুধ ভাবছিস ? আরে বনে যে সব পাখী আছে তারাই হচ্ছে এ রোগের ওষুধ। পোকা লাগা মাত্রই পাখীরা সব পোকা খেয়ে খেয়ে ফেলে দেয়।

পাখীর দুধ

গাছের দুধ ছাড়াও আরো নানা রকমের দুধ পাওয়া যায় এ'দেশে। এমন কি পাখীর দুধও।

হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবারা, ঠিকই বলছি—পাখীর দুধ। আমি নিজের চোখে দেখেছি। টাটকা গরুর দুধের চাইতে ঘন, অনেকটা ক্রীমের মত দেখতে।

তবে এই পাখীর দুধ এখানে কেউ-ই খায় না। আর এই দুধ খাবার প্রয়োজনটাই বা কি ?—অন্যান্য নানা ধরণের দুধ যখন অপর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে। যেমন ধর, খরগোষের দুধ। এটা গরুর দুধের চাইতে অনেক বেশি পুষ্টিকর। অথবা সীলমাছের দুধ।

এটা আবার খরগোষের দুধের চাইতে দ্বিগুণ ভালো। অবিশ্যি যাদের বয়েস হয়েছে বা যারা অসুস্থ তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো পথ্য হবে গিয়ে তোমার তিমি মাছের দুধ। একটা তিমি মাছ দিনে দু'শ লিটার করে দুধ দেয় আর এই দুধে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ গরুর চাইতে বারোগুণ বেশী।

কাজেই বুঝতে পারছিস, এদের পাখীর দুধ খাবার প্রয়োজন থাকার খুব একটা কারণ নেই। কেবল নতুন কেউ ওদের দেশে গেলে ওরা এই পাখীর দুধের স্যাম্পেল তাকে দেখায়—একটু গর্বের সাথেই।

সেই নতুন লোকটি যাতে ওদের সমৃদ্ধি আর স্বাচ্ছন্দের কথা জানতে পারে আর ওরা যে কত আরামে আছে তা বুঝতে পারে, এই কথাটাই একটু ঠারে ঠোরে জানানো হ'ল—এই আর কি।

চোর পুলিশ

এই নতুন দেশে পুলিশের চাকরীর মত সুখের চাকরী আর দু'টো নেই। না না এদের দেশে একেবারে চোর ডাকাত যে নেই, সে কথা বলছি না। তবে কিনা অন্য সব দেশে চোর চুরি করে নিজের বাড়ী চলে যাবার পর যার বাড়ীতে চুরি হয়েছে সে যদি খুব চেঁচামেচি করে, বা নিজে গিয়ে থানায় চুরির খবর দেয়, তা হলে পুলিশ কখনও কখনও চুরির জায়গায় তল্লাসী করতে আসে। এ'দেশে কিন্তু ঠিক তার উল্টো নিয়ম।

ধর, এখানে এক দোকানে, রাত্তির বেলা এক চোর ঢুকেছে। হাতের কাছে যা পেল, অর্থাৎ টাকা পয়সা, জিনিস পত্তর, সবকিছুই সে তার থলিতে বা সুটকেশে—অর্থাৎ যেটা নিয়ে সে দোকানে ঢুকেছিল—তাতে ভরেছে। এখন যখন সব কিছু শেষ, থলিটা নিজের কাঁধে নেওয়া অবধি সারা—চোর বাবাজীবন হঠাৎ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকতে শুরু করেন।

চোরটা এত জোরে চেঁচাতে শুরু করে যে থানায় ঘুমিয়ে থাকা, কাজ না করে মোটা সোটা হওয়া, ঘুমন্ত পুলিশগুলোর ঘুম পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। তারা ধীরে সুস্থে উঠে, হাত মুখ ধুয়ে, জামা কাপড় পরে সাজসরঞ্জাম নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ পর অকুস্থলে এসে পৌছায়। ততক্ষণে দোকানের আশেপাশে বেশ একটা ভীড় জমে গেছে—চোরের অবিশ্রাম চেঁচামেচিতে।

এদিকে চোর দোকানের ভেতর বসে কেবল কাঁদে আর পুলিশকে বারবার বলে চলে, 'ভাই একটু জলদি ঘরে ঢোক, একটু জলদি কর।

দারোয়ান দরজা খুলে দেয়, পলিশ ভেতরে ঢোকে। যেই না পুলিশ দেখা অমনি পুলিশকে জড়িয়ে ধরে চোরের সে কি কান্না। কেঁদে কেঁদে বলে, 'ভাই, যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব আমাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। প্লীজ ভাই, একটু তাড়াতাড়ি আমাকে গ্রেপ্তার করো।'

আস্তে আস্তে পুলিশ দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের পিছু পিছু সেই চোরটা। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে পুলিশ এসে পড়াতে সে সত্যিই খুব খুশী। দারোয়ান আবার দোকানের দরজা বন্ধ করে। ভীড়ের লোকেরাও হাসতে হাসতে যে যার পথে চলে যায়।

তাই বলছিলাম যে এদেশে পুলিশের চাকরীর চাইতে আরাম আর কোন চাকরীতেই নেই।

আদালতে

সে'দিন এ দেশের এক বন্ধু এসে বললেন, 'চলুন, আপনাকে আমাদের এখানকার আদালত দেখিয়ে আনি। আজ একটা খুব নামজাদা কেসের বিচার আছে।'

আদালতে পৌছলাম। একটা আগুন লাগানোর কেস। আসামী অনেক দিন ধরেই অপরাধ করে চলেছে। বন কে বন সে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। কখনও ধরা পড়েনি।

এ'দেশের বহু ডিটেকটিভ অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেছেন আসামী ধরবার জন্য। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাঁরা কাটিয়েছেন বনে বনে। পাগলের মত। নিজেদের চারপাশের সবাইকে সন্দেহ করতে করতে একদিন তাঁরা নিজেরাই পাগল হয়ে পড়েছেন। তবুও আসামীকে ধরা যায় নি।

প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে এই আসামী, আজ এই বনে, কাল ওই বনে জ্বালিয়েছে আগুন, আর সেই আগুনে নষ্ট হয়েছে বনের হাজার হাজার গাছ। একটা বনের সমস্ত গাছ নষ্ট হয়ে যাওয়া ত আর কম ক্ষতির কথা নয়। কারন গাছ নষ্ট হয়ে গেলে লোকেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরবারহও কমে যায় আর একটা বন গড়ে তুলতে সময় লাগে অনেক দিন—প্রায় একটা শহর গড়ে তোলার মতই সময়।

ডিটেকটিভরা যখন সবাই বিফল হয়েছেন, তখন এ দেশের লোকেরা ওদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে, আসামীকে খুঁজে বার করবার ভার দিয়েছিল এখানকারই একজন সাধারণ নাগরিককের ওপরে। সেই সাধারণ লোকটিই নাকি এই আসামীকে পাকড়াও করেছে। একবারে হাতে নাতে। আর আজ সেই আসামীরই বিচার।

কোর্ট বসেছে। নকীব হাঁক পাড়ল, 'আসামী হাজির',

একজন কোর্ট পেয়াদা আসামীকে হাতে করে ঝুলিয়ে নিয়ে এলো বিচারপতির সামনে। হ্যাঁ, হাতে ঝুলিয়ে। ছোট্ট একটা মাটির টব আর তার মধ্যেই আসামী

দাঁড়িয়ে। কোর্ট ঘরে আসামী এসে পৌঁছবার পরেই একটা মিষ্টি সুগন্ধে সারা ঘর ভরে উঠল।

সবার সাথে আমিও ঘাড় উচু করে আসামীকে দেখলাম। আসামী একটি ফুল—খুবই সাধারণ দেখতে জংলা ফুল। সকলের অগোচরে থেকে বছরের পর বছর এই ফুলটি নষ্ট করেছে প্রকৃতির তৈরী আর মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় সম্পদের ভাঁড়ার।

বিচার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, আজ শুধু রায় বেরোবার দিন। বিচারপতি ফুলটিকে খুব কঠোর শাস্তি দিলেন। গভীর তিরস্কারের পর তিনি আদেশ করলেন যে যেখানে যেখানে এই ফুলের গাছ দেখতে পাওয়া যাবে, সঙ্গে সঙ্গেই তা কেটে ফেলতে হবে। আর তাঁর এই আদেশ পালনের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করলেন এ'দেশের সমস্ত ছোট ছোট নাগরিকদের হাতে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ছোটরা যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই মহান কাজ সুসম্পন্ন করবে এই আশাও তিনি জানালেন।

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বিচার সভা শেষ হ'ল।

পাখীর খাঁচা গাছ

একটা বেগুন বা লাউ এর বীজ মাটিতে পুঁতলে তার থেকে কি গাছ পাওয়া যাবে? বেগুন বা লাউগাছই নিশ্চয়।

তেমনি যদি একটা কুমড়োর বীজ মাটিতে পোঁতা হয় তা হলে তার থেকে আমরা একটা কুমড়ো গাছই পাবার আশা করব।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমাদের দেশে অবিশ্যি কুমড়ো বীজ থেকে কুমড়ো গাছই কেবল হয়। কিন্তু এ'দেশে' ঐ মাটিতে পোঁতা কুমড়ো বীজ থেকে যা বার হয়, তাকে সোজা বাংলায়, এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় 'পাখীর খাঁচা।' হ্যাঁ, ছবিতে ঠিক যেমনটি দেখতে পাওয়া যায়, মানে লোকেরা যেমন বনের পাখীদের থাকবার জন্য, গাছের ডালে ডালে খোলামেলায় ঘরের মত কাঠ দিয়ে তৈরী সব খাঁচা ঝুলিয়ে রাখে, ঠিক তেমনি।

এ দেশের লোকেরা পাখী পছন্দ করে তাই প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীর বাগানে এই 'পাখীর খাঁচা' গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছের চাষ করবার জন্য প্রতিটি বাগানেই খানিকটা জমি আলাদা করে রেখে দেওয়া আছে। শীতের শেষে বা বসন্তের শুরুতে লোকে জমি তৈরী করে সেই জমিতে পুঁতে দেয় এই গাছের বীজ।

কিছুদিনের মধ্যেই চারাগাছ দেখা দেয়। তখন চাই একটু যত্ন। নিয়মিত ভাবে জল দেওয়া আর মাঝে মাঝে আগাছা নিড়িয়ে দেওয়া। আস্তে আস্তে চারাগাছ বড় হয়ে

ওঠে, ডালপালা ছড়ায়। পাতা আসে, আর তার পর দেখা দেয় ফুলের কুঁড়ি। ফুল ফুটে ঝরে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে ঝরা ফুলের জায়গা নিয়েছে ছোট্ট ছোট্ট সব পাখীর খাঁচা। খাঁচাগুলোর মাপ অবশ্য তখন একটা দেশলাই বাক্সর চাইতে বড় নয়।

বৃষ্টির জলে চান করে আর রোদ্দুরের আলো খেয়ে খাঁচাগুলো বড় হয়। যখন এ গুলো পুরো সাইজ মত এসে যায় তখন এদের শুধু কেটে নেবার ওয়াস্তা। একেবারে তৈরী পাখীর খাঁচা।

এই জন্য এখানকার বনের সব গাছেতেই অসংখ্য খাঁচা ঝুলছে। আর সেই বাসায় ঘর বেঁধেছে এদেশের সব পাখী। বাগানের বা শষ্যের ক্ষতি করতে পারে—এমন পোকামাকড় এদেশে তাই নেই বললেই চলে।

অর্থাৎ কি না 'যাকে রাখো—সেই-ই রাখে।'

জল বিনা মছলি

মাছ ধরতে খুব একটা ভালো না পারলেও আমি মাছ খেতে ভালোবাসি, আর সব-চাইতে ভালোবাসি মেছুড়ে—অর্থাৎ যারা ওস্তাদ মাছ শিকারী তাদের মাছ ধরা দেখতে অথবা তাঁদের কাছে মাছ ধরার গল্প শুনতে। কাজেই একদিন যখন আমার কয়েকজন বন্ধু এসে বললেন, 'চলুন না কাল, আমাদের সাথে মাছ ধরতে, আমি আনন্দের সাথেই রাজী হ'লাম।

পরের দিন সকাল বেলায় আমার ডাকপড়ার অনেক আগে থেকেই আমি রেডি। তবে বাইরে বেরিয়ে আমার সাথীদের সঙ্গে নেওয়া সাজ সরঞ্জাম সব দেখে আমি ত অবাক। কারুর হাতেই কোন বঁড়শি বা জাল নেই অথচ প্রত্যেকের কাঁধে রয়েছে একটা কোদাল বা মাটি খোঁড়ার গাঁইতি আর কয়েকজনের হাতে ঝুলছে এক একটা করে বড় বস্তা।

'চলুন, চলুন, আর দেরী করবেন না।' দলের একজন বলে ওঠেন। 'আজ কতটা যে মাটি খুঁড়তে হবে তা শুধু ভগবানই জানেন।' 'তবে সময়টা বড় ভালো পড়েছে হে,' একজন বুড়োমত ভদ্রলোক বলেন। 'নদী পুকুর সবই শুকিয়ে গেছে। আরে, আমিই ত আসবার সময় সাইকেলে করে নদী পার হ'লাম।'

নদীতে জল নেই—অথচ মাছ ধরার জন্য ভালো সময়—ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারলাম না। যাই হোক সবার দেখাদেখি আমিও এক দৌড়ে বাড়ীর ভেতর থেকে আমার বাগানের মাটি খুড়বার খুরীপটা সাথে নিয়ে এ'লাম।

নদীর তীরে যখন পেঁৗছলাম তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। নদী বেশ খটখটে

শুকনো—এক ফোঁটা জলও তাতে নেই। কোন কোন জায়গায় গরমের চোটে নীচের মাটিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। আর কোথায় মাছ? একটা ব্যাংও দেখা যাচ্ছে না—কোথাও। অবিশ্যি এই শুকনো নদীতে ব্যাং থেকেই বা করবেটা কি? জল ছাড়া টিকবে কি করে?

আমার মেছুড়ে বন্ধুরা ইতিমধ্যে ছোট ছোট দল করে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছেন। তাঁরা ঐ নদীর শুকনো মাটির ওপরেই হেঁইয়ো হো করে কোদাল চালানো শুরু করেছেন।

দুপুরের খাওয়াদাওয়াটা ভালোই হ'ল। আমিও একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার ডানদিকে যে দলটা মাটি খুঁড়ছিল তারা হৈ চৈ করে উঠল। চেঁচামেচির মধ্যেও 'পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে'—এই শব্দগুলো শুনতে পেয়ে আমিও দৌড়ে গেলাম—কি ব্যাপার, দেখতে।

গিয়ে দেখি সত্যিই একটা বেশ বড়সড় মাছ। শুকনো কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু কাদা মাখা থাকলেও কি তার ছটফটানি আর ল্যাজের দাপাদাপি। বেশ কষ্ট করেই সবাই মিলে ওটাকে ধরে, চালান করা হল একটা বস্তার মধ্যে।

এর পরেই পরপর বেশ কয়েকটা মাছ পাওয়া গেল মাটি খুঁড়ে। তোদের বলতে একটু লজ্জাই করছে যে আমিও শেষে একটা বেশ ভালো সাইজের মাছ বার করে ধরে ফেললাম আমার খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ে। আমার ধরা মাছটা বস্তাবন্দী হবার আগে আমার দিকে দাঁত বার করে খানিকক্ষণ তাকিয়েছিল। ওর তাকানোর ভঙ্গী দেখে আমার মনে হচ্ছিল, ও যেন বলছে, 'কি হে ডাঙ্গার মানুষ, তোমাদের ডাঙ্গায় না কি মাছ থাকে না?'

সমজদার ধান

এক বন্ধু এসে বললো, 'এবারে ধানের দফারফা। দেখুন না, দিনে পাখীর দল এসে সব ধান ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে আর রাতে বুনো শুয়োরের পাল ক্ষেতে ঢুকে গাছগুলোর সর্বনাশ করছে। তার ওপরে ধানগাছগুলোও কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। ওদের বোধহয় একটু আনন্দের প্রয়োজন।'

আমি ত অবাক। ধানগাছের বিষণ্ণতা'—এ সব ত আমাদের দেশের আধুনিক কবিদের কবিতায় থাকে। আমার এ বন্ধ টি ত একজন কৃষি বিজ্ঞানী। ইনিও কি ভেতরে ভেতরে একজন কবি?

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে জানবার জন্য প্রশ্ন করলাম 'তা আপনি কি ঠিক করেছেন?'

—'না তেমন কিছু নয়। চারটা ব্যান্ডপার্টি জোগাড় হয়ে গিয়েছে আর দুটো

পার্টিকে চিঠি লিখে ঠিক করেছি। তাদের আনতে লোকও রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। সবাই এসে পড়লেই গাছগুলোকে একটু আনন্দ দেওয়া যাবে।'

কয়েকদিন পর বন্ধু আবার এসে হাজির। 'চলুন এবার, সব ব্যবস্থা কমপ্লিট।'

আমারও খুব বেশী উৎসাহ ছিল ঘটনাটা ঠিক কি ঘটছে জানবার। তাই আর দু-বার বলতে হল না। বন্ধুর সাথে রওয়ানা দিলাম।

ক্ষেতের পাশে পেঁছে দেখি সে এক এলাহি কাণ্ড। ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। শহরের প্রায় সব ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই হাজির। বেশ একটা মেলা মেলা ভাব।

ব্যাণ্ডপার্টি তাদের বাজনা শুরু করল। সুর আছে কি নেই বুঝলাম না, তবে আওয়াজে কান ঝালাপালা। আর এই বাজনাদারদের বাজাবার কি ষ্টাইল? 'লম্বকর্ণের কেরাসিন ব্যাণ্ডের, কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

ঝাড়া একঘণ্টা বাজিয়ে একদল থামল। ভাবলাম এবার বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়ে কথাবার্তা গল্প-গুজব করা যাবে। কিন্তু ও' হরি। তক্ষুণি আবার দ্বিতীয় দল শুরু করেছে তাদের বাজনা। একই সুর—যা প্রথম দল বাজিয়েছে। সেই রকমই প্রচণ্ড আওয়াজ।

ক্লান্ত হয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়েছি এমন সময় সেই বন্ধুটির সাথে আবার দেখা, উনিও ফিরছিলেন। আমার অবস্থা দেখে একটু হেসে বললেন, 'আপনি ত নতুন লোক তাই বলে দিচ্ছি আপনাকে। এই সাতদিন কানদুটো একটু তুলো দিয়ে ঢেকে রাখবেন।'

'কেন?'

'সাতদিন ধরে এই বাজনা চলবে কি না, তাই। এতে আমাদের ধানগাছের মন ভালো হয়ে উঠলেও অনেক লোকের আবার এই বাজনা শোনার পর থেকেই কি সব কানের গোল-মাল দেখা দেয়। কথাবার্তা ঠিকমত শুনতে পায় না। তাই আপনাকে সাবধান করলাম।

পুরো সাতদিন ধরে বাজনার এই অবিশ্রাম যন্ত্রণা চলল। আমি ভাগ্যিস কানদুটো খুব ভালো করে বন্ধ করে রেখেছিলাম তাই কোন ক্ষতি হয় নি।

আট দিনের দিন আবার সেই ক্ষেতের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি বাজনার গুঁতোয় পাখীরা সব ক্ষেত ছেড়ে পালিয়েছে। আর তার সাথে পালিয়েছে সেই বুনো শুয়োরের পাল। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার যে ধানগাছগুলোকে সত্যিই বেশ তরতাজা বলে মনে হচ্ছে।

এরপর প্রতিদিন নিয়ম করে ধানগাছগুলিকে ছ'ঘণ্টা ধরে এই বাজনা শোনানো হত। দিব্যি বড় হয়ে উঠল তারা, শস্যও হল প্রচুর।

আবোল তাবোলের ভীষ্মলোচন শর্মার ঠিকানা যদি এরা জানত, তা হলে হয়ত কেবল এরাই তাঁর যোগ্য সমাদর করতে পারত।

পয়সার ওজন

সে'দিন পার্কে বেড়াচ্ছিলাম, আর পড়বি ত পড়, দেখলাম যে আমার ঠিক সামনেই সেই পয়সাটা পড়ে রয়েছে।

অন্য কোন লোকের ফেলে যাওয়া পয়সা খুঁজে পাবার মত দুর্ভাগ্য আর কিছুতেই হতে পারে না। কারণ নিয়ম অনুযায়ী তাদের, হয় যার পয়সা হারিয়েছে তাকে, বা তাকে খুঁজে পাওয়া না গেলে পুলিশের কাছে জিম্মা করে, রসিদ নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমি যদি এখন এই পয়সাটা না-ই তুলতে পারি তাহলে আমি লোকই বা খুঁজব কি করে বা কি করেই বা আমি এটা পুলিশের হাতে তুলে দিই?

পয়সাটা একটা সিকির সমান মূল্যের। কেবল আমার পায়ে লাগাতে আমি ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম। আর একটু হলেই আমার ঘাড়টা ভাঙ্গছিল। পয়সাটা তুলবার অনেক চেষ্টা করলাম। ওটার নীচে একটা লাঠি ঢুকিয়ে চাড় পর্যন্ত দিয়ে দেখলাম। মাঝখান থেকে লাঠিটাই ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল কিন্তু পয়সাটা যেখানে ছিল—সেখানেই।

পয়সাটার সাইজ একটা রেল ইঞ্জিনের চাকার মত। পাথরের তৈরী। ওজনটা আর কিছু না হোক খুব কম করে পাঁচশ কেজি ত হবেই। একটা ক্রেণ বা কপিকল জাতীয় কিছু থাকলে হয়ত পয়সাটা তোলা যেত, কিন্তু আমি ত আর ক্রেণ নই বা আমার কাছে কোন কপিকল নেই।

বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করবার পর ঠিক করলাম যে আশেপাশের অন্যান্য লোকেদের সাহায্য নিতে হবে। একটু চেঁচামেচি শুরু করলাম, 'পয়সা পেয়েছি পয়সা পেয়েছি,' ছোটখাট একটা ভীড় জমে গেল। সবাই যেন মজা দেখছে।

'কার পয়সা হারিয়েছে?' আমার প্রশ্ন।

কোন উত্তর নেই। জানতাম কেউ উত্তর দেবে না। এই ওজনের আর এই সাইজের পয়সা হারিয়েছে—এ কথা স্বীকার করবে কোন গোমুখ্যু।

আমার করুণ অবস্থা দেখে লোকেদের বোধ হয় দয়া হ'ল। সবাই মিলে হাত লাগিয়ে কোন রকমে পয়সাটা দাঁড় করালাম। আর আমি হাঁপাতে হাঁপাতে ওটাকে গড়িয়ে নিয়ে চললাম।

সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। রাস্তার লোকজন গাড়ী ঘোড়া সবাই বে যেখানে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। কার ভয়ে? না, একটা সিকির। এর সাথে কারুর যদি ধাক্কা লাগে তা হলেই তো সর্বনাশ। 'পয়সার ওজন' কথাটার এতটা আক্ষরিক প্রয়োগ হতে কখনও দেখিনি।

এখানকার লোকেরা এদের সব পয়সা কড়ি গুদামে খোলা অবস্থায় রেখে দেয়। কোনদিনই তা চুরি হয় না, শুনেছি অনেক অনেক দিন আগে এ দেশে দু-একটা চোর ছিল। এদের একবার এই পয়সা চুরি করার দুর্মতিও হয়েছিল। এখন তাদের দলের সবাই এত পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে পয়সা চুরি করা ছেড়ে দিয়ে পুলিশ হয়ে গিয়েছে। আর দলের সর্দার চুরি করা পয়সার ধাক্কায় খতম্।

নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই ঐতিহাসিক গল্পটা আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

একটি শিকারের কাহিনী

একটু সর্দি মত হয়েছিল। বাড়ীতে বসে আছি। এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হ'ল। ভদ্রলোক নিজে থেকে যেচে এসে আলাপ করলেন।

সাধারণ চেহারার ভদ্রলোক। তবে অসাধারণ হচ্ছে এঁর চোখদুটো, আর তার সাথে রোগা মুখে মিলিটারীদের মত পাকানো গোঁফ। হঠাৎ দেখলে অহিভূষণ মালিকের আঁকা ব্রজদার ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

আলাপ হবার পর ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। উনি নাকি একজন বিখ্যাত শিকারী। জীবনে কত যে শিকার করেছেন তা নিজেও ভুলে গেছেন। মাঝে মাঝে এখনও শিকারে বার হন।

তোদের সবার সুবিধার জন্য ভদ্রলোককে আমি 'ব্রজদা' বলেই বলব।

ভালো হয়ে গেছি। একদিন ভোরবেলায় একটু বাইরে পায়চারী করছি। এমন সময় ব্রজদা এসে হাজির, হাতে একটা ব্যাগ।

'কি করছেন মশায় এই সকালবেলা একা একা? ব্রজদা প্রশ্ন করলেন। 'চলুন আমার সাথে'।

'কোথায়?'

'ঝিলের ধার থেকে কয়েকটা ছররা যোগাড় করে নিয়ে আসি। শুনতে পেলাম একটা হাঁসের পাল এসেছে। তাদের কাছে নিশ্চয়ই বেশ কিছু ছররা পাওয়া যাবে।'

'মানে আপনি ছররা দিয়ে হাঁস মারবেন? তা এরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলছেন কেন? আপনার বন্দুকটাই বা কোথায়?'

'মোটেই ঘুরিয়ে কথা বলছি না। যাচ্ছি হাঁসেদের কাছ থেকে ছররা যোগাড় করতে। আর এর জন্য বন্দুকের দরকারটা কি? এই দেখুন না আমার ব্যাগের মধ্যেই ছররা যোগাড় করার সব সরঞ্জাম মজুত।'

লক্ষ্য করে দেখি ব্রজদার ব্যাগের মধ্যে একটা সত্যিকারের হাঁস বসে আছে।

'আপনি বুঝি ছররা দিয়ে পাখী শিকার করেন?' ব্রজদার প্রশ্ন। 'আমি ত মশায় হাঁস দিয়ে ছররা শিকার করি। এই যে আমার এই শিক্ষিত হাঁসটা দেখছেন না এটাই আমার ছররা শিকারের কল। এই হাসটাকে জলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আমি পাড়ের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকি। হাঁসগুলো যেই এসে বসে, অমনি ছররা বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।'

ব্রজদার ভাষণের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। 'শিক্ষিত হাঁস', 'ছররা বৃষ্টি' কথাগুলো শুনতে একটু অদ্ভুত ত বটেই। ভদ্রলোক রসিকতা করছেন কি না বুঝবার জন্য ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু উনি যথাযোগ্য সিরীয়াস।

ঝিলের ধারে পেঁছিলাম। বেশ বড় একটা হাঁসের দল খেলা করে বেড়াচ্ছে জলের বুকে। ব্রজদা তাঁর 'শিক্ষিত হাঁসটাকে' জলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আমাকে সঙ্গে করে কাছাকাছি একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসলেন। ব্রজদার হাঁসটা খানিক এধার ওধার সাঁতার কেটে পাড়ের খুব কাছাকাছি এসে প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকতে শুরু করল। হাঁসের ডাক শুনে ঝিলের মাঝে বসা হাঁসের দলের থেকে অনেকে এগিয়ে এল তীরের দিকে। তারপর সবাই মিলে একসাথে 'হংসধ্বনি' রাগে গান গাইতে শুরু করল। আমি আর থাকতে না পেরে বলে উঠলাম, 'মশাই, আপনার ছররা বৃষ্টি কোথায়? এত দেখছি কেবল হাঁসের পাল।'

'চুপ, চুপ, আস্তে। আরে মশায় এই হাঁসগুলোই ত ছররা বৃষ্টির আগমনী গাইছে।

হঠাৎ ব্রজদা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন, একটা লাঠি বাগিয়ে ধরে তাঁর শিক্ষিত হাঁসের চারধারে জড়ো হওয়া সেই হাঁসের পালের ওপর এলোপাথাড়ি লাঠি চালাতে শুরু করলেন। দু'টো হাঁস সেই লাঠিচার্জে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। আর বাকী সব চক্ষের নিমিষে হাওয়া। জলে পড়ে রইল ব্রজদার শিক্ষিত হাঁস আর দুটো হাঁসের মৃতদেহ।

'যাক প্রায় বারোটা পাখী পাওয়া গেল।' ব্রজদার গলার স্বর আনন্দে ভরা।

আমি ত হতভম্ব। এ কি রে বাবা। কোথায় বললেন ছররা শিকার করবেন তা না মারলেন দুটো হাঁস। এদিকে আবার বলছেন বারোটা পাখী মেরেছেন। ভদ্রলোক দেখছি রূপদর্শীর ব্রজদার চাইতেও উঁচু দরের।

ব্রজদা হাঁস দুটোর ঠ্যাং ধরে মুখ উলটো দিকে ঝুলিয়ে ওদের দু'হাতে ঝাকাতে লাগলেন। একটা একটা করে মোট দশটা ছররা হাঁস দুটোর মুখের ভেতর থেকে সত্যিই বৃষ্টির ফোঁটার মত বেড়িয়ে এল।

সবগুলো ছররা কুড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ব্রজদা বললেন 'দশটা ছররা। তার মানে দশটা পাখীর গুলি। আর এখানে হাঁস রয়েছে দু'টো। যা ভেবে-

ছিলাম তাই। সেই এক ডজনই হ'ল। কি মশায় আমার কথা বিশ্বাস হল ত? নিন একটা হাঁস নিন। রাতে রোষ্ট করে খাবেন।

কুকুর-রেণু

হাঁস শিকারের পর বেশ কিছুদিন হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলায় আবার ব্রজদার উদয়। পরণে একটা আধময়লা প্যাণ্ট আর গায়ে একটা ছেড়া ফাটা বহু পুরোণ চামড়ার কোট। কোটে একটাও বোতাম এমন কি হাতাদুটো পর্যন্ত লাগানো নেই। প্রাথমিক আলোচনা শেষ করে ব্রজদা নিজের থেকেই কথাটা পাড়লেন—

'আপনি আমার এই কোটটা দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন—তাই না? মশায়, আমার এই কোটের একটা ইতিহাস আছে। না না লজ্জা পাবেন না। সব ইতিহাস আমি আপনাকে খুলে বলছি।'

আমার ইচ্ছে না থাকলেও নিরুপায় হয়ে ভদ্রলোকের পাশে বসে পড়তে হল।

'অনেকদিন আগের কথা।' ব্রজদা তাঁর পাঁচালী শুরু করলেন। 'আমি তখন খুব ছোট। আমার বাবার 'বাঘা' নামে একটা কুকুর ছিল। দেশী কুকুর হলে কি হবে কি তার সাহস আর কি তার চেহারা। এক আমাদের বাড়ীর লোকেরা ছাড়া সবাই ওকে ভয় করে চলত।'

'বাবা ছিলেন খুব নামজাদা শিকারী। শিকারে বেরোলে পরেই বাঘাকে সঙ্গে নিতেন শিকার কোথায় আছে তা দেখিয়ে দেবার জন্য বা শিকার যদি পালায় তবে তার পেছনে ধাওয়া করবার জন্য।'

'একদিন হয়েছে কি, শিকারে গিয়ে বাবা একটা খরগোষকে তাক করে গুলি চালালেন। গুলিটা কিন্তু ওর গায়ে লাগল না। তবে বন্দুকের আওয়াজে ব্যাটা পালালো বনের ভেতরে। হাতের শিকার ফস্কে যাওয়ায় বাবাও গেলেন রেগে, আর দিলেন বাঘাকে সেই খরগোষটার পেছনে লেলিয়ে। মশায়, তিনদিন তিন রাত ধরে বাঘা খরগোষটার পেছন পেছন সমানে ধাওয়া করে, শেষে চার দিনের দিন গিয়ে আপনার শিকার ধরল।'

'তবে এই তিনরাত চারদিনের ক্রমাগত ধকল বাঘা আর সহ্য করতে পারল না। খরগোষটা মুখে করে বাবার পায়ের কাছে এনে দিয়েই বাঘা সেই বনের ভেতরেই মারা গেল।'

'আগেই বলেছি বাঘা ছিল বাবার খুব প্রিয় কুকুর। তাই প্রিয় কুকুরের স্মৃতি মনে জাগিয়ে রাখবার জন্য বাবা এই কোটটা বানালেন বাঘার চামড়া দিয়ে। আর ওর হাড় দিয়ে তৈরী করালেন এই কোটের বোতাম। কখনও শিকারে বেরোতে হলেই বাবা এই

কোটটা গায়ে দিয়ে যেতেন। আর এই কোটেরও একটা আশ্চর্য্য গুণ। বনের যেখানেই শিকার লুকিয়ে থাক না কেন, এই কোটটা বাবাকে টানতে টানতে নিয়ে যেত সেইখানে, আর অমনি এর একটা বোতাম পটাং করে ছিঁড়ে ঠিক যে জায়গাটাতে শিকার লুকিয়ে আছে, সেইখানে গিয়ে পড়ত।'

'গল্পটা কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকছে'। আমি মিন মিন করে বলে ফেললাম।

'হ'তে পারে, হ'তে পারে। কেউ হয়ত বাবার জীবনী লিখেছে, তাই ঘটনাটা আপনার চেনা মনে হচ্ছে'। ব্রজদার গলার স্বর অকম্পিত। 'তা যাক্‌গে—এখন বাকী ঘটনাটা শুনুন। সব বোতামগুলো ছিঁড়ে যাবার পর এই হাতাদুটোও যখন একদিন কোট ছিড়ে বেরিয়ে এসে লুকিয়ে থাকা শিকার দেখিয়ে দিল—বাবা সেই হাতাদুটো কুড়িয়ে শিকার শেষে বাড়ী নিয়ে এলেন। ছেঁড়া বোতামগুলো ত আগে থেকে জমানো ছিলই, এবার তার সাথে হাতাদুটো মিলিয়ে একটা কাগজের প্যাকেটের ভেতরে রেখে দিলেন। অনেকদিন পর সেই প্যাকেট খুলে দেখা গেল হাড়ের বোতাম আর চামড়ার হাতা এই দুই বস্তু মিলে মিশে গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলোর মত হয়ে গেছে। মা' অনেক বকা-ঝকা করা সত্ত্বেও বাবা সারাজীবন সেই ধুলোর প্যাকেট জমিয়ে রেখেছিলেন—কখনও ফেলে দেন নি। যখন উনি স্বর্গে গেলেন তখন আমিই ওটার মালিক হলাম।'

'আমাদের বাড়ীতে এখন বাঘার নাতিপুতিরা থাকে। কিন্তু কি বলব মশায়, সে আর এক আশ্চর্য ঘটনা। এই কুকুরগুলোর মত পেটুক আর আলসে কুকুর তখন এ তল্লাটে আর একটাও ছিল না। শিকারে নিয়ে গেলে কোন শিকার তাড়া করা দূরে থাক, খালি আমার পায়ে পায়ে ঘুরত। এমন কি আমি কোন কিছু শিকার করলেও, সেটাকে যে নিয়ে আসা প্রয়োজন—এটুকু চক্ষুলজ্জাও এই কুকুরগুলোর মধ্যে ছিল না। যতই গালাগালি দিন বকুন, মারুন কোন লাভ নেই।'

'শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে ঠিক করলাম যে ওদের সামনে একটা আদর্শ খাড়া করতে হবে। তাতে যদি এগুলোর মতিগতি পাল্টায়। একদিন সেই ধুলোর প্যাকেটটা বার করে ওদের সামনে খুলে ধরলাম। দেয়ালে বাঘার একটা ছবি ছিল। ঠিক তার নীচে।'

'কুকুরগুলো ভেবেছে কি—আমি বোধহয় ওদের নতুন ধরনের কোন খাবার দিচ্ছি। এই খাবারটার রকম সকম বুঝবার জন্যই হোক, অথবা, ধুলোর গন্ধটা চেনা চেনা মনে হবার জন্যেই হোক, একটা কুকুর আস্তে আস্তে প্যাকেটের ধুলোর গায়ে ওর মুখটা ঠেকালো। এ ব্যাটাই ছিল দলের মধ্যে সবচেয়ে পেটুক আর আলসে। তার পরেই যা ঘটল তা যদি আমি নিজের চোখে না দেখতাম ত' মশায়, ভাবতাম কেউ বোধহয় আমাকে আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছে।'

'কুকুরটা প্যাকেটে মুখ ছোঁয়ানোর সময় ওর নাকে বোধহয় একটু ধুলো লেগে গিয়েছিল, সাথে সাথেই তিড়িং করে এক লাফ মারল কুকুরটা। মাটিতে একটা ডিগবাজী খেয়েই সোজা বাড়ীর বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমিও এই ব্যাপার দেখে একটু যে ঘাবড়ে যাইনি তা নয়। ভাবলাম কুকুরটা পাগল টাগল হয়ে গেল না ত?'

সারাদিন আর ওর দেখা নেই। বিকেল বেলায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন'। মুখে আবার দুটো মরা খরগোষ।'

'বুঝুন একবার কাণ্ডখানা। যে কুকুরকে কোনদিন চোর ডাকাত এলেও দৌড়তে দেখিনি—এমন কি উল্টো দিকেও—সে আজ নিজের থেকে বনে গিয়ে শিকার করেছে। শুধু তাই নয়, মুখে করে বাড়ীতে পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এসেছে তার শিকার। বাঘার ধুলোর আসলি গুণ এ'বারে বুঝতে পারলাম। এখন তাই যখনই শিকার করবার ইচ্ছা হয়, আমি এক চিমটি বাঘার সেই ধুলো আমার কুকুরদের খাবারের সাথে মিশিয়ে দিই। তারপর—আমাকে শুধু একটা ব্যাগ জোগাড়ের কষ্টটুকু করতে হয়। শিকারে যেতে হলে এখন ত আমার একটা বন্দুকও সাথে নিতে হয় না। শিকার ধরা থেকে তা বয়ে নিয়ে আসা—সব কিছুই আমার এই কুকুর গুলো করে। তবে আমার এখন বড় কাজ হচ্ছে দিনের শেষে কুকুর গুলোকে ঘরে ফিরিয়ে আনা। আমি জোর করে ওদের ফিরিয়ে না আনলে ওরা বোধহয় সারাদিন সারারাত ধরেই শুধু শিকার করে যাবে।'

সাঁতারু হাতী

কুকুরের গল্প শুনিয়ে ব্রজদা আমাকে এমন 'ফ্ল্যাট' করে দিয়েছিলেন যে তার ধকল সারতে বেশ কিছুদিন গেল। একদিন সকালবেলা আমি ঘরে বসে, দেশের কথা, তোদের সবার কথা ভাবছি এমন সময় মূর্তিমান উপদ্রবের মত ব্রজদার আবির্ভাব বা অবতরণ।

'এই যে কেমন আছেন মশায়? অনেকদিন দেখাশোনা হয় নি। অবশ্য আমিও এদিকে একটু ব্যস্ত ছিলাম—কাজ নিয়ে।'

যাক্ বাবা, ব্রজদারও তা হলে কাজ থাকে। তবে ওনার কাজটা এত তাড়াতাড়ি মিটে যাওয়ায় একটু দুঃখই হচ্ছিল। অথচ সামনে ত' আর ভদ্রলোককে সে কথা বলা যাবে না। তাই মুখে বললাম, 'কি কাজে এতটা ব্যস্ত ছিলেন?'

'আরে সেই কথাই ত বলতে এসেছি। আমি ত বুঝতে পেরেছি যে এতদিন আমার খবর না পেয়ে আপনি কতটা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কি করব মশায়? বনের

পশু পাখীদের সব নিয়ম কানুন জানে—এমন লোক ত' আর খুব বেশী পাওয়া যায় না। তাই একটু ফেঁসে গিয়েছিলাম, একটু দাঁড়ান, সব খবরই আপনাকে দিচ্ছি।

'পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

'না, না, আমার খাবার আনার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না, বসুন এখানে। ঐ যে আমাদের শহরের দক্ষিণ দিকে একটা নদী আছে না, যার পাশে—ঐ যে নদীটা—আরে মশায় আপনিই ত আমাকে বলেছিলেন যে আপনি ঐ নদী পার হয়েই আমাদের শহরে এসে পেঁছেছিলেন। এখন এই নদী এমনিতে ছোটখাটো ভালোমানুষ ভালোমানুষ দেখতে, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন ঢল নামে তখন সে এক ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দু' পাশের বন টন সব ভাসিয়ে দেয়, তখন তার চেহারাই বা কিরকম আর জলের গভীরতা বা কি, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'কয়েকদিন আগে আমাদের এই নদীতে ঢল নেমেছিল। এত জল যে পাড়ের দু' পাশের বনের ভেতরে তিন চার ফুট অবধি জল দাঁড়িয়ে গেছে। বনের সব জন্তু জানোয়ার এই বন্যায় আটকা পড়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে সে এক বিতি কিচ্ছিরি কাণ্ড।'

'বন্যা যত ভীষণ হোক না কেন, বনের পশুগুলোকে ত বাঁচাতে হবে। তার ওপর হাতি, গণ্ডার, সিংহ, চিতা—এরা সবাই আবার আমাদের দেশের সংরক্ষিত প্রাণী। তাই বন্যার জলে যদি এগুলো ভেসে যায় বা মরে যায় তাহলে ত আর আপশোষের শেষ থাকবে না। কাজেই শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ল এই শর্মার।'

'অকুস্থলে গিয়ে হাজির হলাম। সাথে কোন সঙ্গী সাথী এমন কি একটা বন্দুক পর্যন্ত নেই। প্রথম দিন সব অবস্থা সরেজমিন তদারক করে, তৈরী হবার জন্য বাড়ী ফিরে এলাম।'

'প্রথমে তৈরী করালাম, মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো খুব শক্ত অথচ জলে ভাসতে পারে এমন ইয়া বড় বড় সাইজের গোটা পাঁচেক ভেলা। তারপর যোগাড় করা হ'ল একটা ধনুক, বেশ কিছু তীর, আর প্রচুর পরিমাণে ঘুমপাড়ানী ওষুধ। এইসব সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আমি নিজে চড়ে বসলাম পহেলা ভেলাটায়। পেছনের ভেলাগুলোতে এবার আমার সাথী হল ভারী ভারী ওজনের মাল বইতে পারে এমন গোটা আট-দশ জন কুলী।'

'গোড়ার দিকের ব্যাপারটা খুব সহজ। বনের কাছাকাছি পেঁছে তীরগুলোর ডগায় বেশ পুরু করে ঐ ঘুমের ওষুধ লাগিয়ে নিলাম। তারপর যেই দেখি একব্যাটা সিংহ বা চিতাকে—অমনি 'গুণ টানি ছাড়ি বাণ'। আর আমার নিশানার হাত ত আপনি

জানেনই। নিজের মুখে আর কি বলব? একটা তীরও ফস্কায় না। পায়ে তীরটা লাগবার পরেই পশুটা দু' মিনিটের মধ্যে হাই টাই তুলে, গা 'টা' চুলকে ঘুমে অজ্ঞান। তখন কুলীদের দিয়ে ওকে চ্যাংদোলা করে পেছনের একটা ভেলায় তুলতে কোন অসুবিধাই নেই। আর ওষুধের দয়ায় ওদের ঘুমও যে কি গভীর—তা' নাক ডাকার আওয়াজেই মালুম হচ্ছিল। ঠিক যেন সাতটা লাউড স্পিকারে একসাথে চোদ্দটা গান বাজানো হচ্ছে। ঘুমের ওষুধটা বেশ কড়া ধরণের ছিল কিনা!'

'ঘুমন্ত পশুদের ভেলায় ভরছি আর কোথাও কোন শুকনো উঁচু ডাঙা দেখলেই ওদের সেখানে শুইয়ে রেখে আসছি। সঙ্গের কুলীরাও খুব খুশী। এতগুলো সিংহ আর চিতা খালি হাতে ধরেছে, অথচ গায়ে একটু আঁচড়ও লাগে নি। গ্রামে ফিরে এই আশ্চর্য শিকারের কথা'কে কিভাবে রং ফলিয়ে বলবে সেই নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। কেবল আমিই আনন্দিত হতে পারছিলাম না।'

'নৌকোতে যাচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি যে সিংহ আর চিতাগুলো না হয় যেমন তেমন করে বাঁচানো গেল, এখন হাতী আর গণ্ডারগুলোর সময় কি করব? কারণ প্রথমতঃ আমার এই তীরগুলোত' এদের গায়ের শক্ত চামড়ায় বিঁধবেই না। তারপর ধরুন, তীরও যদি কোনরকমে বিঁধল আর পশুটা ঘুমিয়েও পড়ল, তখন এই চার পাঁচ হাজার কেজি ওজনের লাশগুলো বইবেই বা কে, আর ভেলাগুলো এই ওজন নিয়ে ভেসে থাকবেই বা কি করে? এই সব চিন্তা মনের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে আর দু' পাশের পাড়ে, কোথায় হাতী, কোথায় গণ্ডার খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'শেষবারে যে শুকনো ডাঙ্গার ওপরে কয়েকটা ঘুমন্ত পশু ছেড়ে এসেছি, ফিরে আসবার সময় তার উল্টো দিকের পাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, এক বিশাল হাতীর পাল সঙ্গে কিছু গণ্ডার নিয়ে পাড় ধরে একেবারে লাইন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক যেন ফেরীঘাটের সামনে দাঁড়ানো যাত্রীর দল। এই হাতী আর গণ্ডারের পাল দেখে আমার মাথায় একটা নতুন প্ল্যান খেলে গেল। ভাবলাম একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক না কেন। আমি আমার পেছনের ভেলায় কুলীদের পাড়ে নামতে বললাম।'

'পাড়ে নেমেই কুলীগুলো আমার প্ল্যান মত মহা হৈ চৈ আর চেঁচামেচি শুরু করে দিল। তারপর বনের গাছের কয়েকটা ডাল কেটে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এইবার আগুনের মশাল হাতে কুলীরা লাইন বেঁধে দাঁড়ানো ঐ হাতীর পালের দিকে এগোতে শুরু করল, খুব সাবধানে।'

'কুলীদের এই চেঁচামেচির জন্যই হোক, বা, ওদের হাতের আগুনের জন্যই হোক, মনে হ'ল হাতির দল একটু ভয় পেয়েছে। যেই না কুলীর দল ওই হাতির দলের অনেকটা

কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে অমনি ওদের মধ্যে যেটা সব চাইতে গোদা, সেটা সুট্‌ করে জলে নেমে পড়ল। আর জলে নেবেই—সে কি আশ্চর্যের ব্যাপার—হাতীটা একেবারে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সাঁতারুর মত সুন্দর ভাবে সাঁতার কাটা শুরু করল। প্রায় সাথে সাথেই দলের অন্য হাতীরাও সাঁতার দিতে শুরু করল, লাইন ধরে। আর হাতীদের দেখাদেখি গণ্ডাররাও নেমে পড়ল জলে। তারাও শুরু করল সাঁতার দিতে, হাতীদের পিছু পিছু।'

'সব কিছুই আমার প্ল্যান মাফিক হচ্ছে দেখে আমিও ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে নিয়েছি। তীর ধনুক সব রেখে দিয়ে গাছের একটা লম্বা ডাল কেটে আমি একটা ছিপটি বানিয়ে নিয়েছি? আর তারপরে? সার্কাসের রিং মাষ্টার ঠিক যেমন সাঁই সাঁই করে ছিপটি চালায় একবারও কোন বাঘ বা সিংহের গায়ে না লাগিয়ে, অথচ জানোয়ারগুলো সুন্দর সুন্দর খেলা দেখাতে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবেই এপাশে ওপাশে ছিপটি চালিয়ে আমিও সেই সাতারু হাতী আর গণ্ডারের পালকে পুরো নদী সাঁতরে একেবারে উল্টো দিকের শুকনো পাড়ে এনে তুললাম। একটা কালো কোট, লাল জামা আর লাল প্যাণ্ট পরিয়ে আমার একটি ছবি যদি সেই সময় কেউ তুলতে পারত তাহলে দেখতেন মশায়, সে কি সুন্দর ছবি।'

বৈষ্ণব নেকড়ে

ব্রজদার গল্প শুনে আমার মুখে বোধহয় যথাযোগ্য শ্রদ্ধা বা অবাক হবার ভাব ফুটে ওঠে নি। ব্রজদাও নিজের গলার শব্দে এতটা মশগুল হয়েছিলেন যে আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করবার সুযোগ এতক্ষণ পান নি। গল্প শেষ হবার পর আমার মুখ চোখের ভাব দেখে বোধহয় তাঁর খানিকটা সন্দেহ হল।

'কি হল মশায়? কেমন যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখছি আপনাকে। আরে খুলেই বলুন না আপনার সমস্যাটা কি?'

'আর বলবেন না। যদিও ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। আপনি ত দেখেছেন, বাড়ীর পাশের জমিতে আমি একটু, ছোট হলেও, বাগানমত করেছি। বিশেষ কিছু নেই এই বাগানে, এই একটু বাঁধাকপি, একটু শালগম এইসব। আজ সকালে বাগানে গিয়ে মনটা একদম খারাপ হয়ে গেছে। কে জানি পুরো বাগানটা একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। গাছপালা সব উপড়ে ফেলেছে। কাঁচাপাকা ফল যা' কিছু হাতের কাছে পেয়েছে সব কিছুই ছিঁড়ে খুড়ে খেয়েছে। বেশ যত্ন করে এই গাছগুলো বসিয়েছিলাম—তাই মনটা খারাপ।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এ নিশ্চয়ই নেকড়ের কাজ।'

'না না নেকড়ে কেন হবে ? বললাম না, কেবল ফলপাকুড় গাছপালা খেয়েছে, নেকড়ে কি আর ফল খায় ? নিশ্চয়ই বনের হরিণ-টরিণ হবে।'

'কি পাগলের মত কথা বলছেন আপনি ? হরিণ হতে যাবে কেন ? হরিণ কি আপনার ঘাসপাতা খায়। হরিণ ত শুধু মাংস খেতে ভালোবাসে। বুঝলেন মশায় এ আপনার নেকড়েরই কাজ। ঐ যে কথায় বলে না নেকড়েকে শাকের আঁটি দেখানো।'

আমাদের দেশের প্রবাদ অবিশ্যি 'ছাগলকে শাকের আঁটি দেখানো', কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল। ব্রজদাকে এদিকে আবার বক্তৃতার নেশায় পেয়েছে।

'মশায়, নেকড়ের মত ফলপাকুড় চোর আর দু'টো নেই। এ আমার নিজের বাগানে, নিজের চোখে দেখা। আপনার বাগানে একটু বড় সাইজের তরমুজ হয়েছে কি, আর রক্ষা নেই। বেড়া দিয়েও এদের চুরি ঠেকাতে পারবেন না। গর্ত্ত করে ভেতরে ঢুকে সব ফল নিয়ে পালাবে। আমরা ত হয়রাণ হয়ে গেছি। আপনাদের দেশে আপনারা কি করেন, বলুন দেখি ?'

'আমাদের দেশেও ছাগল বা বুনো হরিণ মাঝে মাঝে ক্ষেতের ভেতর ঢুকে গাছপালা ফলমূল খেয়ে নেয়। তবে বেড়া থাকলে ঢোকে না। জমিতে গর্ত্ত করে ঢুকতে এদের কখনও—

'কি আশ্চর্য দেশ মশায় আপনাদের ! হরিণ খায় ফলমূল আর নেকড়ে খায় মাংস'। ব্রজদার অবিশ্বাস মেশানো স্বর।

আমি চুপ করেই রইলাম।

'আমাদের দেশে মশায় এ'রকম বিদঘুটে ব্যাপার কখনও ঘটে না। হরিণ, ছাগলের মতই মাংসাশী জীব। অবিশ্যি ছাগলের বুদ্ধি হরিণের মত অতটা পাকা নয়। বদ-মায়েসী বুদ্ধিতে হরিণ হচ্ছে সবার ওপরে। গাছে কোন পাখীর বাসা যেই দেখেছে অমনি টপ্ করে পালখটালখ শুদ্ধ পাখীটা পেটের মধ্যে চালান করে দেবে। আরে মশায় আমাদের দেশে ত তাই একটা প্রবাদই আছে—হরিণ পুষেছে মুরগীর ছা'।

'আমরা অবিশ্যি বলি 'নেকড়ে পুষেছে মুরগীর ছা'। আমার জবাব।

'কি অদ্ভুত কথাই না শোনালেন। নেকড়ে মুরগীর ছানা পুষতে যাবেই বা কেন ? তবে আপনাদের দেশের কথা আলাদা। আপনার কাছ থেকে যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়, তবে ত মশায় আপনার দেশের সব লোকের গলাই আপনার মত ছোট ছোট, গাধারা প্যাণ্ট না পরে খালি চামড়ায় ঘুরে বেড়ায়, হরিণ ফলমূল ঘাসপাতা খায় আর নেকড়ে খায় মাংস। সত্যি কি আশ্চর্য রকমের দেশ মশায় আপনাদের।'

আবার বনে

দিন চারেক পর একদিন সকালবেলা ব্রজদা আবার এসে হাজির হ'লেন। এবার তাঁর সাথে অতি কুচ্ছিৎ দেখতে একটা শুয়োর, আর সেই চিরকালের ব্যাগটা।

'চলুন, চলুন মশায়। কি সকালবেলা বাড়ীতে বসে রয়েছেন?'

নিরুপায় আমি, ব্রজদার সাথে সাথী হ'তে হ'ল। রাস্তায় নেমেই ব্রজদা শুরু করলেন।

'এই যে আমার এই পোষা শুয়োরটাকে দেখছেন না, এর নাম 'কন্দ খোজ'। এর অনেকগুলো গুণ আছে। তবে এর সবচাইতে বড় গুণ হচ্ছে ও মাটির নীচে কোথায় কি আছে তার খবর জানতে পারে। আমাদের দেশে মাটির নীচে এক ধরণের কন্দ পাওয়া যায়। মশায় এই জিনিসটার তরকারির যে কি স্বাদ—আপনাকে আর কি বলব। এই তরকারি একবার যে খেয়েছে, সেই শুধু এ কথার মর্ম্ম বুঝতে পারবে। তবে এই কন্দ যোগাড় করার একটাই অসুবিধা। এই তরকারি জন্মায় মাটির গভীরে, অনেক নীচে, ওপর থেকে ত কিছু বুঝবার উপায় নেই কোথায় এই তরকারি মিলবে, আর সেখানেই আমার এই 'কন্দ খোঁজ' সোণার বাহাদুরি। আমার ত যখনই একটু ভালোমন্দ নিরামিষ খাবার খেতে ইচ্ছা হয়, তখনই 'কন্দ খোজ'সোণাকে সাথে নিয়ে, ব্যাগটা কাধের ওপর ফেলে চলে আসি এই বনেতে। একদিনের মধ্যে ও আমাকে প্রায় পনের দিনের মত তরকারী যোগাড় করে দেয়। চলুন, চলুন সব কিছু ত নিজের চোখেই আপনি দেখতে পাবেন।'

বনে পৌছলাম। শুয়োরটার গলায় একটা কুকুরদের চেন দিয়ে বাঁধবার জন্য যেমন 'কলার' পরানো থাকে সেরকম একটা 'কলার' লাগানো ছিল। ব্রজদা সেটা খুলে দিলেন। শুয়োরটা বার কয়েক এদিক ওদিক তাকিয়ে মাটির কাছে ওর নাক নামিয়ে আনল। তারপর হঠাৎ একটু দূরে একটা বড় গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়তে শুরু করল ওর সেই সামনের ওল্টানো দাঁত দুটো দিয়ে।

ব্রজদা আর আমি শুয়োরের পেছন পেছন দৌড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটির প্রায় তিনশ মিলিমিটার নীচ থেকে বার করা হ'ল ওল বা রাঙা আলুর মত দেখতে, মিশমিশে কালো রং এর একটা বলের মত জিনিষ। সেটাকে কন্দ বলব না ছত্রাক বলব—জানিনা। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে শুয়োরটা আরও গোটা কুড়ি ঐ বস্তু মাটি খুঁড়ে বার করেছে। সেগুলোকে বস্তায় চালান করে দিয়ে ব্রজদা বললেন, 'চলুন ফেরা যাক্'।

বেশ তাড়াতাড়িই ব্যাপারটা মিটে যাওয়াতে মনে মনে একটু খুশীই হ'লাম। খানিকটা এগিয়েছি এমন সময় ব্রজদা বললেন 'আপনার ত মশায় কোন তাড়া নেই? এদিকে একটু আসুন ত, আপনাকে একটা জিনিষ দেখাই।'

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার আশায় ছাই দিয়ে ব্রজদার সাথে এগোতে হ'ল। কাছাকাছি একটা ছোটখাট ঢিপির মত জিনিষ দেখিয়ে ব্রজদা বললেন, 'ভালো করে দেখুন মশায়।'

একটা সাধারণ ঢিপিকে কেন যে আমার ভালো করে দেখতে হবে, বুঝলাম না। তবুও ভদ্রলোক বলছেন, এই মনে করে ওটার দিকে লক্ষ্য করে দেখি আরে, এই ঢিপি ত মাটি দিয়ে প্রকৃতির তৈরী নয়, এতো খড় কুটো, অর্থাৎ বনের চারপাশে যা অজস্র ছড়ানো ছিটানো থাকে, সেই সব জিনিষ আর বালি মিশিয়ে তৈরী। কেউ যেন ইচ্ছা করেই এ'টাকে তৈরী করেছে। কে বা কেন, এই বস্তু তৈরী করেছে এ সব প্রশ্ন মনে আসতেই ব্রজদাকে বলে ফেলেছি—

'এটা কি জিনিষ?'

'বিশেষ কিছুই না। একটা পাখীর বাসা। আসুন না ভেতরে ঢুকি।'

একটা গর্ত মত ছিল, তা দিয়ে দুজনে বেশ কষ্ট করে ভেতরে ঢুকলাম। অনেকগুলো ডিম এদিকে ওদিকে ছড়ানো রয়েছে ঠিকই, তবে কোন পাখীকে সেই ডিমের ওপর বসে তা দিতে দেখলাম না। ব্রজদাও বোধহয় আমার মনের চিন্তার ধারাটা বুঝতে পেরে-ছিলেন, তাই আপনা থেকেই বললেন।

'বুঝলেন মশায়, এখানে এই পাখীর ডিমে তা' দিতে হয় না। আপনা থেকেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। আরও তথ্য চান? এই পাখীদের আমরা 'ঝোপের তুর্কী বলে ডাকি। আর এদের এই বাসাটার ওজন মোটামুটি দেড়শ টন।'

মিথ্যা বলব না সব কিছু দেখে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। তাই এবার যখন ব্রজদা আবার বাড়ীর পথে না ফিরে একটা সম্পূর্ণ উল্টোদিকে রওয়ানা দিলেন, আমিও আর কিছু না বলে চুপচাপ ওঁর সাথে চলতে লাগলাম। অল্প খানিকটা হাঁটার পর সামনে পড়ল একটা হ্রদ। পাড়ে দাঁড়িয়ে ব্রজদা আবার শুরু করলেন।

'এই যে হ্রদটা দেখছেন' এর জলটা একটু চেখে দেখুন একবার। কি মশায়, নোনতা লাগছে—তাই না? এই নোনা জলেরও একটা ইতিহাস আছে।'

'কি এক ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখকের পাল্লায় পড়েছি'—আমি বিড়বিড় করে বলি। ব্রজদা আমার দিকে গ্রাহ্য না করে বলে চলেন।

'আসলে আমাদের এ অঞ্চলে যত কুমীর ছিল, তারা সবাই মিলে গ্রীষ্মকালে এই হ্রদের ধারে বসে কাঁদত। কেন যে ওদের এত কান্না, কি যে ওদের দুঃখ, আর শুধু গ্রীষ্মকালেই এই দুঃখের কারণ ঘটে কেন—আমরা সবাই অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও বার করতে পারি নি। এতগুলো কুমীরের, এতদিনের, চোখের জলে, হ্রদের জলটাকেও কেমন যেন নোনতা করে দিয়েছে।'

পরের দিন ব্রজদার বাড়ী থেকে 'কন্দখোঁজের' খুঁজে বার করা কন্দের তরকারী একবাটি এসেছিল। খেয়ে দেখলাম, সত্যিই উপাদেয়।

টেনিদার গল্প

বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে। ব্রজদার দেখা নেই। ভাবলাম একটু শহর ঘুরে আসি। পুরোন বন্ধুদের সাথে দেখাশোনা ত হবেই, তাছাড়া নতুন কারুর সাথে চেনা জানাও হয়ে যেতে পারে।

বিকেল নাগাদ শহরে গিয়ে পৌঁছলাম। দু'বোতল তিমিমাছের দুধ নেবার প্রয়োজন ছিল, তাই একটা দুধের দোকানে ঢুকলাম। আমাদের দেশে যেমন অলিতে গলিতে চায়ের দোকান, এখানে দুধের দোকানও তেমনি অসংখ্য।

দোকানে ঢুকে দেখি, একটা টেবিলের চারপাশে বেশ ভীড়। একজন ভদ্রলোক হাত পা নেড়ে খুব উৎসাহের সাথে কি সব বক্তৃতা দিচ্ছেন, আর, সবাই হাঁ করে ওঁর কথা শুনছে। আমি কাছে যেতেই, আমার চেনা জানা বন্ধুরা, আমার সাথে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিল—খুব খাতির করে।

ভদ্রলোক একজন জাহাজী। এ দেশেরই এক জাহাজে কি যেন একটা কাজ করেন। নাম? নাম জেনে তোদের কি হবে? তবে ভদ্রলোকের নামের আদ্যক্ষরগুলো জুড়লে অবিশ্যি তোদের সবার চেনা একজন মহাপুরুষের নাম হয়। সেটা হচ্ছে টে-নি-দা। কাজেই ভদ্রলোকের পরিচয় তোদের কাছে টেনিদা হয়েই থাক। এখন, টেনিদা বলছিলেন—

'উঃ সে যে কি ভীষণ ঝড়, তা' তোমরা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। চারিদিকে নিকষ কালো অন্ধকার, আকাশভাঙ্গা বৃষ্টি আর তার সাথে সমুদ্র ফুঁসিয়ে তোলা ঝড়। একা একা মাস্তুলের পাশে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অবস্থাটা, আর, আমাদের জাহাজ কোন দিকে চলেছে তা' বোঝবার চেষ্টা করছি। হঠাৎ একটা বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক সেইখানে। ঢেউ এর ধাক্কায় আমি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম দেখলাম, যে ঢেউ এর তোড়ে, আমি ডেকের ওপর থেকে একদম সমুদ্রের ভেতরে। ঢেউগুলো আমাকে নিয়ে যেন ফুটবল খেলতে শুরু করেছে। একবার আমায় তুলছে পাহাড়ের চুড়ায়, আবার এই আমাকে ফেলে দিচ্ছে একেবারে অতল গহ্বরে। মা, বাবা, ভাই, বোন, সবার কথা, তোমাদের সবার কথা এমন কি এই দুধের দোকানদারের কথাও মনে পড়তে লাগল।

কোনদিন আর কার‍ুর সাথে দেখা হবে না মনে করে আমার দ‍ু'চোখ বেয়ে নেমে আসে জলের ধারা।'

'হঠাৎ একটা ঢেউ আমাকে তুলে নিল। আর তুলে নিয়ে এসে জাহাজের ওপর ছ‍ুঁড়ে ফেলে দিল আমাকে। ঠিক যে জায়গাটায় আমি জলে পড়ার আগে দাঁড়িয়েছিলাম—সেই জায়গাটাতেই। আমিও এই সম‍ুদ্রের দেবতা নেপচুনকে অনেক ধন্যবাদটাদ দিয়ে নিজের কেবিনের দিকে দে দৌড়। তাই ত তোমাদের বলছিলাম জাহাজের চাকরী করা অত সোজা নয়।'

টেনিদার চারপাশের শ্রোতাদের ম‍ুখে চোখে একসাথে শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ের ছাপ ফুটে ওঠে। ওনার সামনে গরম দ‍ুধের গেলাস—উনি না চাইতেই—আপনা থেকেই চলে আসে। দ‍ুধে চুম‍ুক দিয়ে টেনিদা সবার ওপরে একবার চোখ ব‍ুলিয়ে নিয়ে আবার শ‍ুর‍ু করলেন।

'এই ধর, আর একবারের কথা। আমাদের জাহাজ মকরক্রান্তির বেশ কাছাকাছি। এত গরম পড়েছে যে তা আর কহতব্য নয়। জামাকাপড় সব খ‍ুলে রেখে আমরা সবাই খালি গায়ে শ‍ুধ‍ু হাফপ্যাণ্ট পরে জাহাজ চালাচ্ছি। রাধ‍ুনী ব্যাটাও এই গরমের স‍ুযোগে যাচ্ছে তাই সব খাবার দিচ্ছে। জাহাজের পাঁচজন খালাসীর হয়েছে সর্দিগর্মি। হঠাৎ দেখি যে সম‍ুদ্রের মাঝখানে ভাসছে এক বরফের পাহাড়। ঐ যে বইয়ের ভাষায় যাকে হিমশৈল না কি যেন বলে—তাই। পনের তলা বাড়ীর সমান উঁচু, আর চওড়াটা কমসে কম দেড়শ থেকে দ‍ু'শ কিলোমিটার ত হবেই। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? বেশ, বল, যে যা দিব্যি করতে বলবে, তা করতে রাজি আছি। এমন কি পীরবদরের দিব্যি পর্যন্ত।'

বরফের পাহাড়টা দেখে সবার সে কি আনন্দ! তক্ষ‍ুনি ডিঙ্গি করে ওর কাছে যাওয়া হ'ল। সারাদিন সবাই মিলে এই বরফের পাহাড়ের ওপর নেচে, গড়াগড়ি খেয়ে, বরফ ম‍ুঠো ম‍ুঠো চিবিয়ে কাটিয়ে দেওয়া হ'ল। এমন কি আমাদের জাহাজের প্যাঁচাম‍ুখো ক্যাপটেন—যিনি সারাদিন পাইপ ম‍ুখে দিয়ে থাকেন, আর গলার ভেতর থেকে প্রায়ই সিংহের মত আওয়াজ করে জাহাজের সবাইকে নিজের তাঁবে রাখেন—তিনিও আমাদের সাথে একবার নেচেছিলেন।

আমাদের এই জাহাজ, এই সফরেই আক্রান্ত হয়েছিল। না, না কোন জলদস্যুর আজগ‍ুবি গল্প তোমাদের বলছি না। আমাদের আক্রমণ করেছিল একটা মাছ। সোজা তেড়ে এসে আমাদের তলায় মারল একটা গ‍ুঁতো। আর সেই রামগ‍ুঁতোর কি জোর। মাখনের টুকরোর মধ্যে গরম ছ‍ুরির মত জাহাজের তলার লোহার পাত, কাঠের পাটাতন,

সব কিছু ফুটো করে দিল মাছটা। আমরা তাড়াতাড়ি সবাই মিলে যেই সেই ফুটো সারিয়ে উঠেছি, অমনি ব্যাটা আর একদিকে গুঁতো মেরে আর এক জায়গা ফুটো করে দিয়েছে। পড়ি কি মরি সবাই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ফুটো বন্ধ করবার জন্য।'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। আমি ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি বলছেন যে জাহাজের তলার লোহার পাত আপনার একটা মাছ ফুটো করে দিয়েছিল ?'

'হ্যাঁ'।

'আর তার ওপরের কাঠের পাটাতনগুলোও ? মানে যেগুলো 'ওক' না কি সব শক্ত শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরী হয়—সেগুলোও ?'

'হ্যাঁ।'

বুঝলাম এতদিনে ব্রজদার জন্য ওষুধ পাওয়া গিয়েছে। ভদ্রলোককে একটু একা পেয়ে বললাম—

'আমি বিদেশী মানুষ এখানে একা একা থাকি। আপনি দয়া করে যদি কিছুক্ষণ সময় আমার সাথে কাটান, ত আমার খুব ভালো লাগবে।'

টৌনদা সানন্দে রাজী হলেন।

মাৎস্যন্যায়

'জাহাজী জীবন বুঝলেন—নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা'। রাত্রে ভরপেট খাওয়া দাওয়ার পর টৌনদার এই গভীর দার্শনিক উক্তি।

'যেমন ধরুন মাছ ধরার সময়। লোকে বলে যে মাছটা পালিয়ে গেল—সেই মাছটাই ছিল সবচেয়ে বড়। আরে, এত নির্ভেজাল সত্যিকথা—এতে হাসবার কি আছে ? একটা মাছ যত বড় হ'বে, বঁড়শির সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে যাবার সুবিধা ত তার ততই বেশী—তাই না ? কাজেই কেউ যখন পালিয়ে যাওয়া মাছটার সাইজ হাত দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করে, তখন কেন যে সবাই মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে—বুঝি না।'

'তবে আমার কথা যদি বলেন ত বলি, বড় মাছে আমার রুচি নেই। আমি ভালোবাসি ছোট ছোট মাছ ধরতে। শুনুন তবে আমার এক মাছ ধরার ঘটনা। জাহাজ সারাই হচ্ছে। আমারও সারাদিনের জন্য ছুটি। আমি একটা ছোট নৌকো নিয়ে বেরিয়েছি—সাগরের ছোট মাছ ধরবার জন্য।'

'খাঁড়ি পেরিয়ে সমুদ্র পড়ে, জলের কাছে কান নিয়ে—মাছেরা কোথায় আছে—তা খুঁজতে শুরু করলাম। এটাই আমার চিরকালের অভ্যাস। মাছেদের কথাবার্তা শুনেই আমি মাছ চিনি, আর ওরাও আমাকে বলে দেয় যে আজ দলে ওরা কত ভারী। অবিশ্যি

মাছের সাথে কথাবার্তা বলে এসব খবর যদি জানতেই না পারি তা তাহলে মাছ ধরবই বা কি করে ? শুধু শুধু টোপ নষ্ট করা আমার মোটেই পছন্দ নয়।'

'যাই হোক, সেদিন আমার কপাল ভালো বলতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করতেই মাছেরা আমাকে বলল যে আজ তাদের দলটা বেশ বড়, তবে মোটামুটি সবাই এক জাতের মাছ। বেশ নিশ্চিন্ত মনে বড়শিতে টোপ গেঁথে নামালাম জলের বুকে। প্রায় সাথে সাথেই একটা মাছ ছুটে এসে টোপটাকে গিলে ফেলল আর বঁড়শিতে গেল গেঁথে। অন্য কেউ হ'লে হয়ত সেই মাছটাকে তক্ষুণি নৌকোতে তুলে ফেলে আবার নতুন টোপ ফেলত। কিন্তু আমি বাবা সমুদ্রের লোক। একদম চুপচাপ বসে আছি। বঁড়শি গাঁথা মাছটাও জলের ভেতরে।'

'একটু পরেই আর একটা মাছ এসে প্রথম মাছটার ল্যাজ কামড়ে ধরল। তারপর তৃতীয়টা এসে দ্বিতীয়টার ল্যাজ ধরল চার নং এসে তিন নম্বরের, পাঁচ এসে চারের···

'ছয় এসে পাঁচের ল্যাজ', আমি আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলাম।

'ঠিক, ঠিক একদম ঠিক বলেছেন। পাঁচের ল্যাজে ঝুলছে ছয়।' টেনিদা আমার দিকে প্রশংসা ভরা চোখে তাকান। 'একের ল্যাজে আর একজন—এইভাবে যখন ছ'টা মাছ গাঁথা শেষ তখন আমি বঁড়শির সুতো গোটালাম। একসাথে পেয়ে গেলাম ছ ছ'টা মাছ। আর এ শুধু একবার নয়। যতবার টোপ ফেললাম ততবারই ঘটল এই ঘটনা। মাছগুলোরও যেন 'প্রভু আমায় ধর ধর' ভাব।'

'তাই যখন দেখি, সারাদিন ধরে রোদে জলে পুড়ে, গভীর রাত্তিরে কেউ মোটে একটা মাছ ধরে বাড়ীতে ফিরছে, আর প্রতিবেশীকে শুনিয়ে শুনিয়ে গিন্নীকে বলছে, 'আমার ধরা এই মাছটার ঝোলটা একটু ভালো করে রাঁধ ত দেখি' আমার ত তখন হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। সারাদিন ধরে একটা মাছ ধরে এ সব ন্যাকা ন্যাকা কথা—আমার একদম সহ্য হয় না।'

আধুনিক সিন্ধবাদ

'এ'বার আমি আপনাকে আমার জীবনের একটা রোমহর্ষক সত্যঘটনার কথা বলব। আপনি ত জানেন আমাদের জাহাজীদের জীবনে কত রকমের যে অভিজ্ঞতা হয় তার ধারণা আপনারা কোনদিনই করতে পারবেন না। একবার একটা তিমি মাছ আমাকে গিলে ফেলেছিল।

বহুদিন ধরে আমি কত লোকের কাছে যে এই কাহিনী বলেছি, তার হিসাব রাখিনি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আমাকে একটা তিমি মাছ ধরে গিলে ফেলতে পারে—এইটুকু

বিশ্বাস করতে লোকে রাজী আছে, অথচ আমি যে সেই মাছের পেট থেকে জ্যান্ত ফিরে আসতে পারি—এই কথাটা বিশ্বাস করতে চায় না। গল্পের এই জায়গাটায় আমি এলেই—সবাই হাসতে শুরু করে। লোকের হাসিঠাট্টা শুনতে শুনতে আমারও এখন মনে মনে একটু সন্দেহ হয় যে সত্যিই কি ব্যাপারটা ঘটেছিল? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি বেশ ভাল লোক। তাই আপনাকে পুরো কাহিনীটাই খুলে বলি।'

'আমি তখন কাজ করি একটা তিমি ধরা জাহাজে; অল্প বয়েস, মনে প্রচুর সাহস আর গায়ে সাতটা সিংহের শক্তি। তিমি ধরতে জাহাজ বেরিয়েছে। কিছুদিন পরে দূরে দেখা গেল একটা তিমি। ক্যাপটেন জাহাজ থামিয়ে নৌকো নিয়ে এগোতে বললেন তিমির দিকে—শিকারের জন্য। নৌকো নামানো হল। আমি বললাম হালে আর অন্য খালাসীরা দাঁড়ে তরতর করে নৌকো এগিয়ে চলল।'

'মাছটাও আমাদের দেখতে পেয়েছে। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আকাশে তুলে দিয়েছে তার নাকের জলের ফোয়ারা। আর সময় নেই।'

'আমি হুকুম দেবার সাথে সাথেই দু দুটো হারপুণ ছুটে গিয়ে বিঁধেছে মাছটার গায়ে। আর তখনই শুরু হল যত গোলমাল। মাছটা হঠাৎ পেছন ফিরে ঘুরে গিয়ে ল্যাজ দিয়ে মারল এক ঝাপটা, আর সেই ল্যাজের ঝাপটার ধাক্কায় আমরা নৌকো টৌকো সব উল্টে শূন্যে উড়ে গেলাম। শূন্য থেকে যখন জলের দিকে পড়ছি, হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে আমি মাছটার খোলা মুখের দিকে এগিয়ে চলেছি। ভয়ে আতঙ্কে আপনা থেকেই আমার হাত পা সব কিছু বুকের কাছে গুটিয়ে এল।'

'বোধহয় কয়েক পলকের জন্য বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরে এ'ল তখন দেখি যে আমি সোজা মাছটার গলার ভেতরে গিয়ে পেঁছেছি। কপাল ভালো বলতে হবে যে মাছটার অতগুলো খোঁচা দাঁত থাকা সত্ত্বেও কোনটার সাথেই আমার ঘষা খেতে হয় নি। মাছটাও বোধ হয়, আমি যে ওর গলার ভেতরে গিয়ে পেঁছেছি, তা, বুঝতে পারে নি। চারিদিক শ্যাওলার মত পেছল। আমিও গলা থেকে পা হড়কে এবার সোজা মাছের পেটের ভেতরে।'

'আপনি বোধহয় মনে মনে ভাবছেন যে এবার আমি তিমি মাছের পেটের ভেতরের গহণ কালো অন্ধকারের একটা কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দেব। অবিশ্যি আপনারই বা দোষ কি? আপনি ত আর কখনও তিমির পেটের ভেতর দেখবার সুযোগ পান নি।

'আসলে তিমির পেটের ভেতর অন্ধকারের কোন বালাই নেই। একেবারে আলোয় আলোময়। চারদিকে হাল্কা নীল রং এর আলো জ্বলছে। সেই আলোতে নিজেকে একবার ভালোমত দেখে নিলাম। যাক্ হাত পা সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। কিছুই

ভাঙ্গেনি বা খোয়া যায় নি। নাক কাণও ঠিক আছে। বাতিতে যখন চারপাশ দেখতে পাচ্ছি তখন নিশ্চয়ই চোখটাও বেঁচেছে। তিমির পেটের ভেতরে বেশ হাওয়ার স্রোত বইছে। শরীরের কোন কিছু না খুইয়ে এরকম একটা অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়া কজনের ভাগ্যে ঘটে বলুন। আমার মন ত একটু প্রফুল্লই হয়ে উঠল।'

'কিন্তু বুঝলেন এই নীল রং-এর বাতি, হাওয়ার স্রোত—এত সব ভালো ভালো জিনিষ থাকা সত্ত্বেও—কেবল একটা জিনিষ—সব কিছু ভালো নষ্ট করে দিয়েছে। সেটা হল তিমির পেটের ভেতরের গন্ধ। আর সে কি দুর্গন্ধ রে বাবা। অন্নপ্রাশনের ভাত উল্টে আসা গন্ধ, তার কাছে ছেলেমানুষ। দুর্গন্ধে আমার মাথা ঘুরতে শুরু করল, আমার দম বন্ধ হয়ে এল। আর জ্ঞান রাখতে পারলাম না। অজ্ঞান হয়ে সেই তিমির পেটের ভেতর পড়ে রইলাম।'

'কতদিন যে এভাবে কেটে গেল জানি না বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি বন্দরের হাসপাতালে শুয়ে, আর আমার সঙ্গী সাথীরা আমাকে ঘিরে রেখেছে।'

'ডাক্তারদের যত্নে, আর আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় বেশ তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলাম। অভিজ্ঞতা স্মৃতি হয়ে গেল। কেবল একটা জিনিষ সারা জীবনের জন্য সঙ্গী হয়ে রইল। এই যে আমার গায়ে জেব্রার মতো ডোরা ডোরা দাগ দেখছেন এগুলোর কথাই বলছি। এই দাগের কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আসলে তিমিটা আমাকে হজম করা শুরু করেছিল কি না? তবে, আমার এই দাগ বেঁচে থাকুক। না হলে হয়ত দেখতেন আমি—ঐ যে তিমির নোংরার মধ্যে পাওয়া যায়—সেই এক টুকরো এ্যাম্বারগ্রিস হয়ে—কেবল আমি সাগরের ঢেউএ ঢেউএ ভেসে বেড়াচ্ছি। আপনার সাথে আলাপ করবার সুযোগই ঘটত না।'

ঢেউ এর পর ঢেউ

'হ্যাঁ, ভালো কথা ঢেউ এর কথায় মনে পড়ল। আপনারা হচ্ছেন ডাঙার মানুষ—মাটি নিয়ে কারবার করেন। সমুদ্র সম্পর্কে আপনাদের কোন ধারণাই নেই। ডাঙার ওপরে কত উঁচু পাহাড়, কত উঁচু গাছ, এই সব নিয়েই ব্যস্ত আপনারা। আচ্ছা আপনার কি মনে হয়? সাগরের একটা ঢেউ কত বড় হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

ঠিক কি উত্তর পেলে টেনিদা খুশী হবেন বুঝতে পারলাম না। তাই আন্দাজে বললাম, 'কত আর হবে?' খুব বেশী হলে ধরুন পাঁচ ছয় মিটার উঁচু।'

'হাহা। হাহা, হাসালেন স্যার, হাসালেন। আপনার আগে আর এক ভদ্রলোককেও এই প্রশ্নটা করেছিলাম। তা আপনারা, মানে ডাঙার লোকেরা ত সোজাসুজি কোন

প্রশ্নের উত্তর জানিনা বলতে লজ্জা পান তাই এই ভদ্রলোকও সোজাসুজি জানিনা না বলে, ঘুরিয়ে নাক দেখালেন। কে জানে কার লেখা একটা মোটা বই বের করে তা থেকে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে আমাকে বললেন যে এক ভদ্রলোক নাকি সব অংক টংক কষে বলেছেন, সমুদ্রের ঢেউ কখনও বলে আট মিটারের চাইতে উঁচু হতে পারে না। আট মিটার উঁচু, মানে মাত্র একটা দোতালা বাড়ীর সমান—এটা আবার একটা ঢেউ নাকি? আমরা, যারা পুরোন জাহাজী তারা এই সব ঢেউকে গ্রাহ্যই করি না। আরে এই সাইজের ঢেউ ত যখন তখন যেখানে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।'

'এখন আমি যদি আপনাকে একটা দশতলা বাড়ীর সমান উঁচু ঢেউ এর কথা বলি, তাহলে কি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারবেন? কি মশাই সাইজ শুনেই নার্ভাস হয়ে পড়ছেন? আর সেই ঢেউ এর যেমন চেহারা—তেমনি তার রূপ। আপনাদের ডাঙার পাহাড় টাহাড় কোথায় লাগে তার কাছে? এই ঢেউ এর চেহারাও যেমন বিশাল তেমনি মানানসই তার গতি। প্রয়োজন হলে অবশ্য একটা এরোপ্লেনের চাইতেও জোরে সে ছুটতে পারে। এই রাজপুত্তুরের সাথে আমার জীবনে একবারই দেখা হয়েছিল। সেই দেখা হওয়ার ঘটনাটি আমার মনে একেবারে দাগ কেটে আছে। এনার সাথে একবার মোলাকাত করিয়ে দিতে পারলে……

'আর পরের কথা যদি আরও শুনতে চান তা হলে বলি, পনের তলা বাড়ীর সমান উঁচু, আর দুশ কিলোমিটার লম্বা ঢেউ এর কথা। কি স্যার পছন্দ হচ্ছে ত এনাকে? কি বলছেন হচ্ছে না? তা ত হবেই না জানি। কারণ যদি কখনও ইনি দয়া করে একবার আপনাদের ডাঙার ওপর এসে আছড়ে পড়েন, তাহলে আপনারা কেউ-ই—এমন কি আপনাদের সেই অংক কষিয়ে ভদ্রলোককে পর্যন্ত ওপর তলার টিকিট কেটে নিজের নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসাতে হবে। এ'রকম ঢেউ, একটা বড় সড় জাহাজকে জল থেকে তুলে চীনেবাদামের খোসার মত ডাঙায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, বা জলের জাহাজকে আপনাদের এরোপ্লেনের মত আকাশে উড়িয়ে দিতে পারে।' আমি এই ঘটনা ঘটতে দেখেছি নিজের চোখে।'

টেনিদা উঠলেন। আগামীকাল আবার ওণার জাহাজ ছাড়বে—কাজেই আর থাকতে পারবেন না। ঘরের দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে কি মনে করে থমকে গেলেন। পাঁচ মিনিট ঠায় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন।

'বুঝলেন মশাই এই হচ্ছে গিয়ে আপনার সমুদ্র। আপনারা ডাঙার লোকেরা কিচ্ছু জানেন না, বোঝেন না কেবল বুলি কপচান, যত্তোসব—

'যাকগে, আপনি বলছিলেন না একা একা আছেন। ঠিক আছে, এই শহরে আমার

এক দাদা থাকেন। না না উনি জাহাজী নন। উনি এখানে ডুবুরীর কাজ করেন। তাঁকে আপনার কথা বলে যাব। উনি না হয় এখানে এসে আপনার সাথে মাঝে মাঝে গল্প সল্প করে যাবেন। হ্যাঁ উনিও ঐ দুধের দোকানেতেই বেশীর ভাগ সময় কাটান। আশা করি, আপনার ওনাকে বেশ ভালোই লাগবে।'

টেনিদা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

ডুবুরীর সাথে

দিন দু তিন বাদে আবার গেলুম শহরে, সেই দুধের দোকানে। টেনিদার দাদাকে খুঁজতে হল না। টেনিদার পাশের টেবিলে অনেক দলবল নিয়ে বসে আছেন। টেনিদার সাথে চেহারায়ও কোন মিল নেই। টেনিদা বেশ রোগা আর লম্বা—ইনি মোটা আর বেঁটে। বাঁজখাই গলার স্বর। বোঝা গেল খুব মেজাজী লোক। কোন কথার প্রতিবাদ বা ওনার সাথে তর্ক করা একদম পছন্দ করেন না। করলে ভীষণ চটে যান আর হাতের কাছের টেবিল বা চেয়ারের ওপর ঘুঁষি মেরে সেটাকে হয় ভেঙ্গে ফেলেন, অথবা অপর পক্ষকে চুপ করিয়ে দেন।

একটু ফাঁকায় পেয়ে আলাপ করলাম। টেনিদার কথা তুলতেই, উত্তর দিলেন 'জানি'। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ আমাকে একটা প্রশ্ন করে বসলেন।

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে একটা হাঙ্গর, একটা তালা, একবস্তা আলু আর আধখানা তেরপল খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে ?'

ব্রজদা আর টেনিদা আমাকে অনেকটা তৈরী করে দিয়েছেন কাজেই একটুও না ঘাবড়ে সোজা উত্তর দিলাম 'নিশ্চয়ই'।

ভদ্রলোক খুশী হ'লেন, বললেন, 'টেনিটা এমনিতে বোকা হলেও আপনার সম্পর্কে দেখছি ঠিকই বলেছিল। চলুন আপনার বাড়ী যাই।'

বাড়ীর দিকে রওয়ানা হ'লাম। পথে সামান্য আলাপ পরিচয় হ'ল। বাড়ীতে ঢুকবার আগে আবার দুম্ করে আমাকে আর এক প্রশ্ন,

'আপনার রক্তের কি রং ?'

ঘাবড়ে গিয়ে মুখ ফসকে সত্যি কথাটাই বেরিয়ে গেল, 'লাল'।

বাজের আওয়াজের মত গলার স্বরে টেনিদার দাদা বলে উঠলেন 'আমার রক্তের রং সবুজ'।

সবুজ রক্ত

'আমার চেনা জানা সবাই আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে মানুষের রক্তের রং লাল,

পাখীর রক্ত লাল এমন কি মাছের রক্তের রং ও নাকি লাল। কিন্তু সবাই চাইলেই ত আমি আর বোকা বনে যাবো না। অবিশ্যি আমি হচ্ছি ডুবুরী। আমার কাজ কারবার জল নিয়ে। কাজেই পাখী-টাখী, মানুষ, পশু বা জানোয়ার—এদের ব্যাপারে আমি বিশেষ কিছুই জানিনা, আর সেইজন্য কাউকে কিছু বলিও না—ভাবি হয়ত হবেও বা।'

'কিন্তু আমার নিজের রক্তের রং বা মাছের রক্তের রং নিয়ে কেউ যদি কখনো কোন কথা বলে—হুঁ হুঁ বাবা সেখানে আমার সাথে কোন চালাকীই চলবে না। কারণ এ রক্তের রং আমার নিজের চোখে দেখা। একদম সবুজ। ঘটনা শুনুন—একেবারে প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ।'

'সেদিন সমুদ্রে নেমে বেশ খানিকটা নীচে যখন গিয়ে পেঁছেছি—হঠাৎ একটা হাতুড়ি মুখো মাছের সামনাসামনি পড়ে গেলাম। আপনি নিশ্চয়ই 'হাতুড়ি মুখো' মাছ দেখেছেন? সেই যে দেহটা মাছের মত আর মাথাটা ঠিক একটা হাতুড়ির মত দেখতে? এই ব্যাটার হাতুড়িটা ছিল আবার পেল্লায় সাইজের। মাছটিকে দেখেই আমি ওর পাশ কাটিয়ে চুপচাপ চলে যাচ্ছি। হঠাৎ ব্যাটার মনে কি হল, ছুটে এসে ধাঁই করে আমার মাথায় মারল এক হাতুড়ির বাড়ি। মাথাটা ঘুরে গেল। আমি জলের নীচে কাদাবালির ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম।'

'মাছটা বোধহয় কোন কারণে বাড়ী থেকে বেরোবার সময় ওর, গিন্নীর সাথে ঝগড়া করে এসেছিল এখন তাই আমার ওপর দিয়ে ওর রাগের সেই ঝাল ওঠাতে চাইছে। আমি এদিকে জলের নীচে কাদার থেকে নিজেকে হাঁচোড় পাঁচোড় করে তুলতে চাইছি, আর ব্যাটা আমার খুব কাছাকাছি থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর এর কি নজর? যেই একটু উঠে বসতে গিয়েছি, অমনি আবার মাথায় হাতুড়ির আর এক ঘা। দুবার মাথায় হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে আমিও সতর্ক হয়ে গিয়েছি, তাই এবার যখন মাছটা আবার তেড়ে এল তখন আমিও মাথা সরিয়ে নিয়েছি। এবার হাতুড়িটা পড়ল আমার ডান হাতের ওপর। কড়ে আঙ্গুলটা থেঁতলে গেল।'

'পরপর বেশ কয়েকটা হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে আমার তখন রাগ চেপে গেছে। আপনি ত জানেনই ডুবুরীদের সাথে সর্বদাই একটা বড় ছুরী থাকে। সেটাকে খাপ থেকে বার করে 'যা থাকে বরাতে' বলে মারলাম মাছের গায়ে এক কোপ—আর তখনই দেখতে পেলাম।'

'দেখলাম যে আমার সেই থেঁতলানো কড়ে আঙ্গুল আর মাছের গা'—দুটো থেকেই সমানে রক্ত বেরোচ্ছে। আর সেই রক্তের রং কি বলুন ত? হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, শুধু সবুজ, সবুজ এবং সবুজ।'

'এতে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আপনাকে ত আমি আগেই বলেছি যে সব মাছের রক্তের রংই হচ্ছে সবুজ। যেমন ধরুন আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করল ঘাসের রং সম্পর্কে। আপনি কি 'কমলা রং ছাড়া অন্য কোন রং বলতে পারেন? অকারণে ত আর মিথ্যা কথা বলবেন না আপনি। কি ব্যাপার, আপনার মুখ চোখ অমন দেখাচ্ছে কেন? আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহ'লে আপনিই বলুন ঘাসের রং কি?'

তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক হাতদুটো মুঠো করে আমার সেই ব্যাংএর ছাতার টেবিলের ওপর রেখেছেন। এনার এক ঘুষি বোধ হয় আমার এই টেবিল সহ্য করতে পারবে না। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম 'ঘাসের রং কমলা আর রক্তের রং সবুজ'।

টেনিদার দাদা খুব খুশী হয়ে চেয়ারে বেশ আরাম করে বসলেন।

দাদাকথামৃত

'তবে জোয়ারের জলের রং লাল।' দাদা বলে উঠলেন।

'জোয়ারের জল সবুজ', আমার প্রতিবাদ।

'লাল'। দাদার গলার স্বর একটু শক্ত হয়ে উঠল। হাত দুটো আবার টেবিলের ওপর। 'লাল রং এর জল। কি? ঠিক বুঝেছেন ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে ঘাসের রং কি হ'ল?'

'কমলা'।

'আর রক্ত?'

'সবুজ'।

'হ্যাঁ বেশ। তবে এর ভেতরে একটা কথা আছে। লাল জোয়ার এলেই মাছেরা সব মরে যায়। গায়ে লাল ঢেউ লেগেছে কি, মাছেদের দফা রফা।'

'মাছেরা সব মরে যায়'। আমিও তোতাপাখির মত আবৃত্তি করে চলি।

'কাঁকড়াগুলোও সব মরে যায়'।

'কাঁকড়াগুলোও'। আমার প্রতিধ্বনি।

'গেঁড়ি, গুগলি শামুক সব।'

'কুচো মাছ আর জলের পোকাও মরে যায়'। আমিও যোগান দিই।

'ডাঙার লোকেরা সবাই কাঁদতে থাকে আর খুব কাশতে থাকে।'

'তাদের খুব হাঁচিও হতে থাকে'। আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিই।

'ঠিক বলেছেন।' দাদা খুব খুশী হলেন তাঁর সাথে আমার এমনভাবে সঙ্গত করার জন্য। খুশীর প্রকাশ অবশ্য আমার টেবিলের ওপরে এমন এক ঘুষির মধ্য দিয়ে হ'ল যে টেবিল উল্টে, কাপ টাপ ভেঙ্গে সব একাকার।

'কি এখন আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে ত?' আমার চোখে চোখ চেয়ে দাদার প্রশ্ন।

'নিশ্চয়ই'।

জলের খেলে

'শুশুকদের কখনও বল খেলতে দেখেছেন?' দাদার আচমকা প্রশ্ন।

'আজ্ঞে দেখেছি।'

'কখনও দেখেন নি', দাদা বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলেন।

'আজ্ঞে তাহলে দেখিনি'।

'তাই ত বলছি। এখন শুনুন আমার কাছে। শুশুকরা, বুঝলেন কিনা, বেশ ভালো বল খেলতে পারে। তবে এরা বাস্কেট বলটাই বেশী পছন্দ করে। আপনাদের এই মানুষদের চাইতে এরা খারাপ ত খেলেই না, বরং অনেক অনেক বেশী ভালো খেলে। তবে এদের সব খেলাই জলের ভেতরে। বল পাস করা, বল ধরা এমন কি ঐ যে আপনার দুটো তলা খোলা নেটের বাক্স থাকে না, তার মধ্যে বলটাকে গলিয়ে দেওয়া অবধি—এই শুশুকেরা নাক দিয়ে ঠেলে ঠেলে খেলে। আর কি তাদের লক্ষ্য। গোল দিতে গিয়ে একবারও মিস করে না।'

হঠাৎ কথা থামিয়ে তীক্ষ্ন চোখে দাদা পুরো এক মিনিট চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। কিন্তু আমিও জিভ কামড়ে ঠোট চেপে পড়ে রয়েছি।

'এদের সাপোর্টার, ফ্যান সবকিছুই আছে কিনা।' দাদা বলে চললেন। সীল মাছেরাই হচ্ছে এদের খেলার মূল দর্শক। শুশুকেরা যখন বল খেলছে, সীলমাছগুলো তখন পাড়ে বসে কি চেঁচানটাই না চেঁচায়, আর মাঝে মাঝেই হাততালি দেয়। কি তাদের উত্তেজনা! মানুষদের খেলা কোথায় লাগে এদের খেলার কাছে?'

আমি একেবারে নিশ্চুপ।

'খেলা শেষ হ'লে আপনি অবিশ্যি ক্যাপ্টেনের পিঠে চড়ে পুরো খেলার মাঠ—থুড়ি-পুকুরটা এক চক্কর দিতে পারেন।'

'আমি কোন সাড়াশব্দ দিলাম না।

'বা আপনি চাইলে ক্যাপটেনকে দিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে মুক্তোওয়ালা ঝিনুক তুলিয়ে আনতে পারেন।'

আমার তরফ থেকে এবারও কোন আওয়াজ নেই।

'এই ত আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। প্রথমে ত আমার মনে হয়েছিল আপনি আমার কথা বিশ্বাসই করছেন না।'

সাগর তলে

'বুঝলেন আমি একবার পুরো এক সপ্তাহ সমুদ্রের নীচে কাটিয়েছি। সেখানে যে এত সব সুন্দর দৃশ্য দেখেছি না, আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না।'

ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্ন করলাম, 'এক সপ্তাহ ধরে জলের নীচে আপনাকে কেন থাকতে হয়েছিল ?'

'খুব সোজা হিসেব, একটা ঝিনুক আমার পা কামড়ে ধরেছিল। ঠিকমত দেখতে পাইনি, তাই ঝিনুকটার খোলা মুখের মধ্যে আমার পা পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ও খোলা দুটো বন্ধ করে আমাকে ধরে একেবারে যেতে নাহি দিব।' ঝিনুকটার ওজন প্রায় পাঁচশ কেজি মতন হবে তাই ছাড়াতে অনেকটা সময় কেটে গেল। আমারও নানা রকমের অভিজ্ঞতা হল।'

'তা, ওখানে এ'কদিন কি খেলেন ?'

'কি আর এমন ? হাতের কাছে কয়েকটা বাঁধাকপি আর শশা পাওয়া গেল তাই-ই চিবালাম।'

'আর জল খান নি ?'

'খাবার জল ওখানে একটা সমস্যাই নয়। অগুন্তি ঝরণা আছে, আর সে ঝরণার জল কি যে মিষ্টি আর ঠাণ্ডা তা আর কি বলব।'

'যাক্ আপনার যে খুব একটা কষ্ট হয়নি জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। আশ্চর্য জিনিষ কি কি দেখলেন ?'

'কি দেখে আশ্চর্য লাগেনি তাই বলুন। সমুদ্রের শয়তানের কথা ত অনেক শুনেছেন, দেখেছেন কখনো ? আমি দেখেছি, আবার সেই শয়তানের নাচও দেখেছি। মুশকো মুশকো কালো কালো শয়তান সব—শিং আর ডানা আছে। জলের ভেতরে খানিকটা দৌড়ে নিয়ে হঠাৎ জলের বাইরে লাফ দেয়। আর কি তাদের লাফের জোর। এক এক লাফে তিন মিটার হাইজাম্পের পোল স্বচ্ছন্দে টপকে যাবে। পেটের ওপর ভর দিয়ে, ঝপাং করে যখন জলে পড়ে, তখন যা ঢেউ হয়—দেখবার মত। আর ঢেউ হবে নাই বা কেন ? এক একটা শয়তান ত আপনাদের ডাঙ্গার বাসের মত চওড়া, ওজনও তদনুপাতিক—এক টন বা তার বেশী। সমুদ্রের খাবার দাবার যে খুব পোষ্টাই তা এদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

'একটা বেশ সুন্দর জেলী মাছের সাথে দেখা হল। প্রায় দশতলা বাড়ীর সমান উঁচু। আমার ত দেখতে ভালোই মনে হল। তার ওপরে ওর গা জুড়ে একটা সবুজ আলোর আভা।'

'প্রায় একমাঠ ভর্ত্তি জীবন্ত ঘাস দেখেছি। হঠাৎ দেখলে আপনার মনে হবে যেন হাওয়ায় দোলা সর্ষেক্ষেত দেখছেন। কিন্তু যেই না একটু হাত বাড়ানো অমনি ঘাসগুলো যে কোন গর্ত্তে লুকিয়ে পড়ে, ধরা যায় না।'

'একটা অক্টোপাসের সাথে দেখা হল। সে তার সব কটা হাত দিয়ে একটা বাক্স বানিয়েছে। সেই বাক্সতে ভরেছে নিজের ডিম, আর তাতে তা' দিচ্ছে।'

'দেখলাম মা' মাছ তার বাচ্চাদের নিয়ে সাগরের তলায় বেড়াতে বেরিয়েছে। ঠিক যেন মুরগী মা'র সাথে তার বাচ্চারা। তফাৎ কেবল এক জায়গায়। কোন বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা হলে মা মুরগী তার বাচ্চাদের লুকায় নিজের ডানার তলায়, আর এখানে, মা তার সবকটা বাচ্চাকে নিজের মুখের ভেতর পুরে চোঁচা দৌড় লাগায়।'

'একটা ইলেকট্রিক বাণ মাছ দেখলাম। বোধহয় নিজের ব্যাটারীটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছে।'

'জেট ইঞ্জিন লাগানো একটা মাছ দেখলাম। এই ইঞ্জিন চালিয়ে মাছটা একেবারে ধনুক ছাড়া তীরের মত জল কেটে এগোচ্ছে।'

আমার মাথা ভার হয়ে উঠেছে। তাই আর থাকতে না পেরে প্রশ্ন করেই বসলাম 'রেল ইঞ্জিন লাগানো মাছ দেখেন নি আপনি?'

'না'।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'যাক্ বাবা, বাঁচা গেল'।

দাদা একটু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'যাই অনেক রাত হয়ে গেল।'

আমি আর একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

পাহাড়ের গান

সবেমাত্র ভোর হয়েছে কি হয়নি আমার দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। আর সেই ধাক্কার আওয়াজে আমার ঘুমেরও দফারফা।

টেনিদার দাদা ফিরে এলেন না কি? কথাটা মনে আসতেই আমার হাত, পা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল।

শেষে সাহসে ভর করে দরজা খুললাম। না, দাদা নন। এ' আমার শহরের এক বন্ধু। শহরে থাকবার সময় ওর সাথে আলাপ হয়েছিল। পেশায় ভূতাত্ত্বিক।

নামটা ঠিক মনে নেই। তবে ওর নামের মধ্যে কোথাও 'শিলা' কথাটি ছিল। ওকে এই বলেই ডাকব।

ছোটোখাটো দেখতে রোগা পাতলা লোকটি। কানদুটো খালি একটু বড় আর ওর নাকটার সাথে পেয়ারার আশ্চর্য মিল।

ওকে দেখে মনে আনন্দ হ'ল। এই একজন অন্ততঃ আমাকে গল্প শোনাবে না। ও আমাকে নিজের থেকেই বলল, 'চল একটু ঘুরে আসি। অনেক কিছু দেখবার আছে।'

ডবল খুশীর খবর। কারণ নিজে কোন জিনিষ দেখলে সেটা সম্বন্ধে যতটা বোঝা যায় বা জানা যায়, অপরের মুখে শুনে বা তার লেখা পড়ে ত আর ততটা বোঝা যায় না। তার ওপর যদি বক্তা বা লেখকের কল্পনাশক্তি একটু প্রবলভাবে থাকে তা হলেই ত সর্বনাশ। কোনটা ঠিক সত্যি, কোনটা লেখক ভেবেছিলেন সত্যি বলে, আর লেখক বা বক্তার মতে কোনটা সত্যি হওয়া উচিত ছিল, এ সবের জট খোলা ত প্রায় অসাধ্য—অন্ততঃ আমার কাছে। কাজেই শিলার নেমন্তন্ন পেয়ে তিন মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিলাম।

বালি দিয়ে তৈরী করা একটা পাহাড়ের কাছে এসে পেঁছিলাম। কিন্তু যেই না তাতে চড়া শুরু করেছি অমনি আমাদের চারপাশে বাজনা বেজে উঠল। মনে হচ্ছিল আমরা যেন বালির ওপর দিয়ে না হেঁটে একটা বিশাল অর্গানের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। কিছুক্ষণ পরে শুরু হ'ল ঐকতান। তার আওয়াজ কখনও মৃদু কখনও বা জোরে। অর্গানের সাথে এবার যোগ দিয়েছে বাঁশি, সানাই আর ঢোল। শুনতে বেশ ভালো লাগলেও একটু যে ভয় ভয় করছিল না তা' নয়।

শিলা আমার অবস্থা দেখে যে খুব মজা পাচ্ছিল, তা বুঝতে পারছিলাম। ওরু কুলোর মত কান দুটো নড়ছিল।

হঠাৎ শিলা আমাকে পেছনে রেখে নীচের দিকে এক দৌড় লাগালো। কিছুদূর দৌড়ে, পা ছড়িয়ে বসে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগল অনেকটা স্লিপ খাবার মত করে। তখন সে কি প্রচণ্ড আওয়াজ। তার সাথে হাজারটা জয়ঢাকের শব্দ।

বাজনাটা থামবার পর পাহাড়ের নীচ থেকে শিলা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমিও ওর মতই দৌড় দিয়ে আর খানিকটা পথ হড়কে নেমে এলাম নীচের জমিতে। আবার শুরু হ'ল সেই পাহাড়ের গর্জন আর ঢাকের বাদ্য।

পাহাড়ের বাজনা শুনে আমি খুব খশী আর আমার খুশী দেখে—শিলাও।

সেদিন বেশ অনেকটা সময় ধরে শিলা আর আমি ঐ পাহাড়কে দিয়ে গান গাইয়েছিলাম।

ফুলের গোপন কথা

এই 'গায়ক পাহাড়'কে পিছনে ফেলে রেখে শিলা এবার আমায় নিয়ে এল ঐ পাহাড়েরই এক উপত্যকা অঞ্চলে। চারদিকে প্রচুর ফুল ফুটে রয়েছে। সুন্দর, সুন্দর নীল রং-এর ফুল। এখানে এসে শিলা ফুল তুলতে একটু বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সে, একবার এই গাছের কাছে যাচ্ছে, ফুলটা ছিঁড়ে তুলছে আর তারপর ফুলটাকে চোখের কাছে নিয়ে কি যেন সব খুব মনোযোগের সাথে দেখছে। এই কাজ করতে করতে বিড়বিড় করে নিজের মনে আবার কি সব বলাবলি করছে। মাঝে মাঝেই পকেট থেকে একটা খাতা বার করে তাতে ও যেন কি সব লিখছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যে শিলা যেন ফুলেদের সাথে, বা গাছেদের সাথে কি সব গোপন কথার আদান-প্রদান করছে। সে ফুলের গাছগুলোকে কিছু একটা প্রশ্ন করছে—আর ফুলগুলো সেই প্রশ্নের যা জবাব দিল খাতায় তা নোট করে নিচ্ছে।

শিলার কাণ্ড-কারখানা দেখে আমি একটু অবাক হয়ে পড়লাম। প্রথমে ভাবলাম এও বোধহয় পাহাড়ের মত কোন মজার ব্যাপার হবে। কিন্তু শিলা এবারে একদম সিরিয়াস্। তারপরে মনে হল লোকটা পাগল টাগল হয়ে গেল না ত? কারণ শিলা এবার যা সব কাজ করছে তাতে ত ওকে ভূতাত্ত্বিক বলে মনেই হয় না। যদি একদম পাগল না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ও এখন যা করছে তা ত একজন প্রকৃতিবিদের কাজ—যাঁরা গাছ টাছ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। আর এ দুয়ের মধ্যে যদি কোনটাই ঠিক না হয় তাহলে ও নিশ্চয়ই কবি। আর ও যদি কবি হয়ে থাকে—তাহলে ত আমি, এক কবির সাথে ফুলের বাগানে—ভয় পেয়ে গেলাম।

কৌতূহল আর চাপতে না পেরে শিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি অমন বিড় বিড় করছ কেন?'

'আরে ভাই এই মাটির অনেক অনেক নীচে সাতরাজার ঐশ্বর্য লুকানো রয়েছে, তারই খবর পেয়েছি।

'কেমন করে খোঁজ পেলে?'

'কেন এই ফুলেরা আমাকে বলে দিল যে।' শিলার মুখে এক গাল হাসি 'এই সব ফুলেরাই আমাকে বলে দিল।'

আমি ত অবাক। এ'দেশের ফুলের ব্যাপার হলেই সেটা গোলমেলে হয়ে যায়।

এ দেশের এক ফুল বনে আগুন লাগায় আবার আর এক ফুল এনে দেয় মাটির নীচের ঐশ্বর্যের খবর – আর অ'রা নাকি কথা বলে।

'বুঝলে হে, আমাদের দেশের ফুলেরা খুব বুদ্ধিমান।' শিলা বলে চলে, 'এরা মাটির নীচের সব খবর জানে।' তোমার খালি এদের ভাষাটা শিখতে হবে, তারপর তুমি এ'দের কাছ থেকে যা কিছু জানতে চাও, প্রশ্ন কর—জবাব পাবে।'

শিলার আনন্দ যেন আর ধরছে না। ও সবগুলো তোলা ফুল বুকের কাছে নিয়ে এসে ওদের গন্ধ নিচ্ছে। শেষে সব কটা ফুল দিয়ে একটা বড় তোড়া তৈরী করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এ'টা তোমার জন্য। ফুলের ভাষাটা শিখে নাও, তা হলে কত অজানা জিনিস জানতে পারবে।

আমরা এই ফুলের বাগান ছেড়ে চলে আসবার কয়েকদিনের মধ্যেই শিলা আবার ওখানে যায়। এবার ওর সাথে অবিশ্যি অনেক লোকজন আর নানা যন্ত্রপাতি ছিল। আমাকেও সাথে নেয়। ফুলের বনে গিয়ে ওর সাথের লোকজন, ওর দেখান জায়গায় মাটি খোঁড়া শুরু করে। কিছুটা খুঁড়বার পরেই মাটির নীচে পাওয়া যায় এক সুবিশাল তামার খনি।

ফুলের ভাষাটা শেখা হয়নি বলে মনে একটু আপশোষ রয়ে গেছে।

বাহারে পালক

ফুলের বাগান থেকে ফিরছি। শিলা বলল, 'চল আমাদের এখন 'পালক যোগাড় সপ্তাহ চলছে। তোমাকে দেখিয়ে আনি। তোমার বোধহয় ভালোই লাগবে।'

ওদের 'পাখীর খামারে' এলাম। সমবায় পদ্ধতিতে খামার চালানো হয়। এত নানা রকমের সুন্দর সুন্দর পাখী এখানে, যে গুনে শেষ করা যায় না।

'বছরে একবার, এই পুরো সপ্তাহ ধরে এখানকার পাখীর পালক যোগাড় করা হয়। তখন অবিশ্যি সব পাখীরই পালক তুলবার চেষ্টা চলে। না, না, পাখীদের কোনরকম কষ্ট দেওয়া হয় না। পালক যোগাড় করবার একটা নতুন কায়দা আমরা বার করেছি। আমরা এই কায়দাটার নাম দিয়েছি, 'ভয় দেখাও···পালক নাও'। পাখীগুলো এমনিতে বেশ ভালোমানুষ। তবে ভয় পেলেই এরা এদের সব পালক ঝেড়ে ফেলতে থাকে। তখন সেই ঝরা পালকের চোটে চারদিক অন্ধকার।'

এদের ভয় দেখাবার কায়দাটাও বেশ মজার। যে ভদ্রলোক খামার দেখাশোনা করেন, তিনি একটা ময়লা বস্তা নিয়ে এসে পাখীর খাঁচার তারে সেটাকে ঝুলিয়ে দেন। তারপর একটা মোটা লাঠি দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে সেই ময়লা বস্তাটা পিটতে শুরু করেন। পাখী-

গুলো এই আওয়াজ শুনেই এত ঘাবড়ে যায় যে ওরা সাথে সাথেই নিজেদের সব পালক টালক ফেলে দিয়ে সবাই মিলে জড়ো হয়ে খাঁচার এক কোণে গিয়ে বসে থাকে। তখন সেই খামারের ভদ্রলোক যে বস্তাটা দিয়ে পাখীদের এতক্ষণ ভয় দেখাচ্ছিলেন···তার ভেতরেই সেই ঝরা পালকগুলো ভরে নেন।

খুব সুন্দর দেখতে এক ধরনের পুরুষ পাখীর পালক যোগাড় করাটা অবিশ্যি এত সহজ নয়। এদের ল্যাজগুলো হয় বিশাল লম্বা আর সেইজন্য এদের খাঁচাগুলোও রাখা হয় প্রায় দোতলা সমান উঁচু মাচার ওপরে। পাখী খাঁচায় বসে আছে দোতলায়, আর তার ল্যাজ ঠেকেছে নীচের মাটিতে—এ দৃশ্য প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় এখানে।

এই পাখীদের যত ভয়ই দেখানো হোক না কেন, এরা কখনও এদের সেই বাহারে ল্যাজের পালক ঝরায় না। তাই এদের পালক তুলতে গেলে অবিশ্যি হাত দিয়ে তোলা ছাড়া কোন উপায় নেই। তবে এদের একটা পালক তুললেই ত বারোটা টুপির পক্ষে যথেষ্ট।

ও, বলতে ভুলে গেছি, এদেশের লোকেদের মধ্যে, যাঁরা টুপি পরেন, প্রত্যেকের টুপিতেই কোন না কোন পাখীর পালক গোঁজা। এদের বালিশ তোষক সব কিছুর ভেতরেই ভরা থাকে···না তুলো নয় সেই ভয় পাওয়া পাখীদের ঝরা পালক।

আমার শিকার

বাড়ীর পথে ফিরছি আমরা দুজনে। পথে একটা জলা মত পড়ে। হঠাৎ দেখি জলার পাড়ে রাস্তার পাশে একটা ব্যাং বসে। ড্যাব ড্যাব করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কখনও এত বড় ব্যাং দেখিনি। প্রায় একটা বড় সড় মুরগীর সাইজ। আর কি তার গলার আওয়াজ। ঠিক যেন ষাঁড় ডাকছে। দেড় কিলোমিটার দূরে আমার বাড়ী থেকেও ওর ডাক শুনতে পাওয়া যাবে পরিস্কার।

একটা ঢিল ছুড়লাম ওর দিকে। ব্যাংটা, ঢিলটা গ্রাহ্যও করল না। আর একটা ঢিল—তাতেও না।

আমার কেমন যেন রাগ চেপে গেল। ব্যাটাকে রাস্তার পাশ থেকে সরাতেই হবে। শিলাকে বললাম 'তোমার বন্দুকটা একবার দাও ত।'

শিলাও বোধ হয় ফুলের চিন্তায় একটু অন্যমনস্ক ছিল। ওর ছররা ভরা বন্দুকটা আমার হাতে দিয়ে দিল। আমি সেটাকে ব্যাং বাবাজীর দিকে তাক করে তুলে ধরতেই সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার হাত চেপে ধরল।

'আরে কি সর্বনাশ, তুমি কি ঐ ব্যাংটাকে গুলি করতে যাচ্ছ না কি ?'

'হ্যাঁ ব্যাটাকে আমি মারবই।'

'সর্বনাশ, অমন কাজটিও কোর না। এখন ত ব্যাং মারার সময় নয়। আর তার ওপরে তোমার ব্যাং মারার লাইসেন্সও নেই। একে গুলি করলে বন্দুকের আওয়াজে পুলিশ দৌড়ে আসবে এক্ষুণি। আর এসে যদি দেখতে পায় যে তুমি ব্যাং মেরেছ, তবে বন্দুকটা বাজেয়াপ্ত ত করবেই, সাথে সাথে তোমার আর আমার···দু'জনারই জেল, জরিমানা সব কিছু।'

অগত্যা আমার প্রথম শিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হল।

মাছের ঝোল

একটু জ্বর মত হয়েছিল। তাই শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। বেশ রোগাও হয়ে পড়েছি।

আমার এ'দেশের বন্ধুরা আমার শরীর খারাপের খবর জেনে খুব উৎকণ্ঠিত ছিল। যেই না আমার জ্বর ছেড়েছে, অমনি আমার খাবার জন্য এক গামলা ভর্তি ছোট ছোট জ্যান্ত মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে। কোনদিন হয়ত মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম যে আমাদের দেশে জ্বর সেরে গেলে রুগীকে ছোট মাছের ঝোল খেতে দেওয়া হয়—সেই কথা মনে রেখে।

মাছগুলো এত সুন্দর আর এত জীবন্ত দেখতে যে ওগুলোকে কেটে কুটে ঝোল বানাবার ইচ্ছা হ'ল না। তার বদলে ভাঁড়ার থেকে খুঁজে বার করলাম একটা বড় মাপের ডেকচি। বেশ ভালো করে পরিষ্কার করে, জল দিয়ে ভর্তি করে মাছগুলো ছেড়ে দিলাম ওটার মধ্যে। মনে মনে আশা, যে মাছেদের খেলা দেখে অন্ততঃ খানিকটা সময় কাটানো যাবে।

কিন্তু মাছগুলো যেন আমার বন্ধুদের ইচ্ছাপূরণ করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেই না ওদের ডেকচিতে ছাড়া,একটার পর একটা মাছ আমার চোখের সামনে উল্টে গিয়ে একদম তলায় ডুবে যেতে লাগল। না কোন নড়াচড়া—প্রাণের কোন লক্ষণই ওদের নেই। শুধু কতকগুলো মরা মাছ ডেকচির তলায় পড়ে।

চোখের সামনে অতগুলো সুন্দর মাছের এমনভাবে মৃত্যু দেখলে কার না মন খারাপ হয় ? অতগুলো মাছ—ফেলে দিতেও মন সরল না। ঠিক করলাম ওগুলো খেয়েই ফেলব। তবে জ্বরের পেটে মরা মাছ খাব ? সাবধানের মার নেই ভেবে ঠিক করলাম যে মাছগুলোকে ঝোলের ভেতর দেবার আগে গরম জলে বেশ সেদ্ধ করে নেওয়া যাক। তাতে এদের মধ্যে জীবাণু বীজাণু যাই থাক না কেন—সব বেরিয়ে যাবে।

এই সব চিন্তা ভাবনা করে আমি উনুনে বেশ ভালো মত আগুন জ্বালালাম আর সেই আগুনের মধ্যে বসিয়ে দিলাম আমার মরা মাছ ভর্ত্তি জলের ডেকচিটা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জল থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। ভাবলাম মাছগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে দিই—যাতে ওদের চারদিকেই গরম জল লাগতে পারে।

ডেকচির কাছে গিয়ে দেখি সে এক অবাক কাণ্ড। আমার সব কটা মরা মাছই আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে—জলের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে। যতই জল গরম হচ্ছে ততই যেন ওদের আনন্দ বাড়ছে। আমি ঝোলের সাথে লুচি খাবো বলে একটু ময়দা মেখে ছিলাম। সেই ময়দার একটা গুলি যেই না ডেকচির মধ্যে ফেলা অমনি সেটাকে লুফে খাবার জন্য মাছেদের কি আকুলি-বিকুলি।

সেই দিন থেকে যতদিন আর ও'দেশে ছিলাম, ঐ সুন্দর মাছের ঝোল খাওয়া আমার আর হয়ে ওঠেনি। তার বদলে ঘরের ভেতরে বসিয়েছিলাম একটা তোলা উনুন। উনুনের ওপর আমার ডেকচি—তাতে ফুটন্ত জল। আর সেই ফুটন্ত জলে মজার দেশের মজার মাছ খেলা করে বেড়াত। মাছের খেলা দেখেই আমার মন ভরে যেত। জ্যান্ত হয়ে ওঠা মরা মাছ খাবার আর প্রয়োজন কি?

পেরেক খোর পাখী

যে সব পাখী ধান গম বা এই ধরনের শষ্য খায়—তাদের আমরা বলি শষ্যভুক পাখী —আর যারা পোকা মাকড় ধরে খায় তাদের বলি পতঙ্গভুক্। কিন্তু যে পাখী পেরেক খায় তাকে কি বলি—বলু ত?

মাছ খাওয়া হ'ল না জানতে পেরে, আমার বন্ধুরা একদিন আমাকে মাংস খাওয়াবে, ঠিক করল। একদিন এক বন্ধু একটা ঢাউস পাখী এনে আমাকে বলল, 'এই নিন আপনার জন্য এনেছি। একদম আসল পেরেকখোর পাখী।'

'পেরেকখোর পাখী? কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। অবিশ্যি এ তার সাথে আরও অনেক কিছু খায়, তবে কিনা পেরেক খেতেই এ পাখীটা একটু বেশী পছন্দ করে।

পাখীটাকে কাটা হল। যখন রান্নার জন্যে মাংসের টুকরো করা হচ্ছে আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পাখীর পেটটা চিরে ফেলা হয়েছে। পাকস্থলীটা পেরেক আর নানা জিনিষে ঠাসা। তামার পেরেক, ইস্পাতের পেরেক, লোহার পেরেক—আর শুধু পেরেকই নয়, পাখীর পেট থেকে বার হল বালি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, লোহার টুকরো, তামার পয়সা, দরজার কব্জা,

কটা চাবি, ছোট ছোট সীসার গুলি, প্লাস্টিকের বোতাম, দু'টো ছোট ঘণ্টা (তার মধ্যে একটা এখনও ঠুং ঠুং করে), পাথর, নুড়ি, সিগারেটের টুকরো, কাঠের কুঁচি, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো, সুতো, পেন্সিল, একটা ভোঁতা ছুরি আর একটা পেন্সিল মোছা রবার।

সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে পাখীটা এই সব খাবার খেয়েও বেশ বহাল তবিয়তে ছিল। আমি ওকে কেটে ফেলবার আগে একটা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দেখেছি—পাক্কা নব্বই কেজি। অর্থাৎ প্রায় তিনটা বড় খাসীর ওজন।

মাছখোর পাখীদেরও এত ওজন হ'তে কোনদিন শুনিনি। আর লোকে বলে কিনা—মাছ খাওয়া স্বাস্থ্যকর !

ভোজ কর যাহারে

ভালো হয়ে গেছি। এদিকে সেই সমজদার ধানও মাঠে পেকে উঠেছে। এখন শষ্য কাটবার সময়।

আমাদের দেশের নবান্নের মত, এখানেও শষ্য কেটে ঘরে তুলবার পরে একটা সার্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। সবাই নিমন্ত্রিত। তার ওপরে আমি একজন অতিথি বলে কথা—ক'দিন ধরে যার সাথেই দেখা হ'য়েছে, সেই-ই প্রশ্ন করেছে,—ভোজে আসছেন ত ?' শুনলাম না কি একশ রকমের পদ রান্না হয়, আর আমি বিদেশী অতিথি বলে সবগুলো আইটেমই আমাকে চাখতে হবে। তোরা ত জানিস, আমাকে নিমন্ত্রণ করলে আমি কক্ষনো 'না' বলিনা। পাছে নিমন্ত্রণকর্ত্তা মনে দুঃখ পান। আর তার ওপরে এ দেশের ভোজের খাওয়া দাওয়াটাই বা কেমন, সেটা জানবার ইচ্ছা পুরোদমে ত আছেই।

ভোজের দিন নিমন্ত্রণের জায়গায় গিয়ে দেখি, সে এক এলাহি কাণ্ড। অসংখ্য লোক। আমাকে খুব খাতির টাতির করে একটা প্রথম দিকের টেবিলে বসিয়ে দিল। বাতাসে রান্নার সুগন্ধ ভেসে আসছে। কি আসে, কি আসে এই প্রত্যাশায় ধুকধুকে বুক আর জলেভরা মুখ নিয়ে আমি আস্তিন গুটিয়ে একেবারে রেডী হয়ে বসে রয়েছি।

হঠাৎ দেখি সবাই ওপরের দিকে তাকাচ্ছে। দেখাদেখি আমিও সে'দিকে তাকালাম। আর তাকিয়েই…ঠিক বই এর ভাষায় 'আ হা কি দৃশ্য। জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।'

একটা বিশাল ক্রেনে চেপে একটা প্রকাণ্ড ঘরের মত জিনিষ ঝুলতে ঝুলতে আসছে। কাছে এলে বুঝতে পারলাম, যে যাকে একটা ঘর ভেবেছিলাম, সেটা আসলে একটা মাছ ভাজার কড়াই। তার ভেতরে ডুবু ডুবু তেলে ভাজা পঞ্চাশ হাজার টুকরো মাছে।

হ্যাঁ, এটা মাছ ভাজার কড়াই-ই বটে। এর ওপরে কুড়ি বাইশ জন লোক দাঁড় করিয়ে দিলেও তাদের এতটুকু কষ্ট হবে না। এমনকি এই লোকেরা যদি এই কড়াই এর ওপরে দাঁড়িয়ে সমবেত নৃত্য প্রদর্শনও করে…তাহলেও।

ভোজে উপস্থিত সমস্ত নিমন্ত্রিত লোকেরা, সেই বিশাল কড়াই এর ভেতরের পঞ্চাশ হাজার টুকরো মাছের থেকে এক এক টুকরো মাছ ভাজা নিজের পাতে তুলে নিলেন। তারপর কড়াই খালি হয়ে গেলে আবার ক্রেণে ওটাকে সরিয়ে ফেলা হ'ল।

মাছভাজা শেষ হবার পর একে একে আসতে লাগল ওদের দেশের বিখ্যাত খাবারগুলো। প্রথমে দিল ব্যাংএর শুটকি, এক প্লেট করে সাপের মাংস, নাম না জানা মাছের ডিম, আর তার সাথে দিল সমুদ্রের আর মাটির শামুকের সাথে মেশানো বাঁশের আগা দিয়ে তৈরী এক উপাদেয় স্যালাড।

একমনে খেয়ে চলেছি আর মনে ভাবছি, এর পরে আবার নতুন কি ?

এবার হাজির হ'ল, পাখীর বাসা, পিঁপড়ে ভাজা আর পঙ্গপালের তরকারি। এ-গুলোর সাথে মৌমাছির রস আর বোলতার আচার খেতে হবে। তা নয়ত বেশী খাওয়া যাবে না।

এতক্ষণ পরে, খাবারের রকম দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। এ সব পদার্থ ত আমার গলা দিয়ে নামবে না। চারপাশের অন্যান্য অতিথিদের অবস্থাও আমার মত কিনা দেখবার জন্য এ'দিক ওদিক তাকাতে থাকলাম।

ও হরি ! সবাই খুব মনোযোগের সাথে খেয়ে চলেছে। সাথে পুরোদমে চলেছে পাশের লোকের সাথে গল্পগুজব। স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে এ খাবারে তাদের একটুও আপত্তি নেই। আমার ঠিক পেছনের টেবিলে একটা ভালো খাইয়ের দল বসেছে। তাদের, 'আর একটু পিঁপড়ের ডিম ভাজা দিয়ে যাও হে, এই পাতে আর এক প্লেট ব্যাং', এই সব হাঁকে ডাকে জায়গাটা সরগরম।

কাপে করে ভালুকের রক্ত দিয়ে গেল সাথে জলঝাঁঝির স্যালাড। পঙ্গপাল দিয়ে তৈরী কেক, শুয়োপোকার রুটি আর এক ধরনের কচুরির মত জিনিষ। ভেতরে কি জানি কি পোকার পুর। দু একটা পোকা ত এখনও নড়ছে।

ভয়ে আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

জানা অজানা আরও কত রকম খাবার আসতে শুরু করেছে। কিন্তু ততক্ষণে আমি সারা। আর নয়, চুপি চুপি হাতটাত ধুয়ে উঠে পড়েছি। আমাকে উঠতে দেখে আশেপাশের কয়েকজন নিমন্ত্রিত আমাকে প্রশ্ন করলেন, ম্লান হেসে উত্তর দিলাম, 'সবে অসুখ থেকে উঠেছি এখন এত খাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না।'

আসলে আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। যতই খেতে ভালোবাসি না কেন, এ সব খাবার কি কোন মানুষে খেতে পারে ?

আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এলাম। ঘরে দুধ আর রুটি ছিল—তাই খেয়ে শুয়ে

পড়লাম। ভোজ পুরোদমে চলছে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত তার আওয়াজ কানে ভেসে আসতে লাগল।

পোকার নামে স্মৃতি সৌধ

এ দেশে আর যা কিছুর কমতি থাক না কেন মনুমেণ্ট বা স্মৃতিসৌধের কোন কমতি নেই। বড় ছোট হাজারো রকমের মিনার শহরের নানা জায়গায় ছড়ানো। এর কারণ, এ দেশের একটা প্রচলিত নিয়ম আছে যে কেউ যদি, এদের বিশেষ কোন উপকার করে থাকে, তা হলে তার নামে অমনি একটা মিনার তৈরী করে দিতে হবে—এটা এদের কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা পদ্ধতি।

একটা শুঁয়োপোকার সম্মানে তৈরী মিনারের আবরণ উন্মোচন করা হবে। সেই উৎসবে আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেখানেই গিয়েছিলাম।

শুঁয়োপোকাটার বংশ যে খুব একটা উঁচুদরের—তা মনে হ'ল না। খুবই সাধারণ ঘরের পোকাটা। আমরা বাগানে বা বনের গাছের ডালে যে জাতীয় পোকা হামেশাই দেখতে পাই, ঠিক তাদেরই মত দেখতে। কিন্তু বললে বিশ্বাস হয় না যে—এই অতি সাধারণ শুয়োপোকার মত দেখতে পোকাটাই এদেশের লোকেদের বাঁচিয়েছে এক ভয়ঙ্কর ক্ষতির হাত থেকে। আর তার ফলে এদেশের লোকেরা নিজেদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে এই মিনার উৎসর্গ করে—এই শুয়োপোকার নামে।

ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি।

বেশ কিছুদিন আগে, বুনো জানোয়ারের আক্রমণ থেকে শষ্যের ক্ষেত বাঁচাবার জন্য এদেশের লোকেরা তাদের ক্ষেতের চার পাশে এক ধরণের জংলা কাঁটাগাছের বেড়া লাগানো শুরু করে।

প্রথম প্রথম সব কিছুই বেশ ভালো ভাবে চলছিল। বেড়ার গাছগুলোকে কোনও দেখভাল করতে হয় না। আপনা আপনিই তারা বড় হয়। সুন্দর দেখতে ফুলও ফোটে, আর এদের কাঁটার খোঁচা খেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বুনো শুয়োর, মোষ আর বাঁদরের পাল লোকেদের শষ্য ক্ষেতে ঢোকা ছেড়ে দিল। সবাই খুব খুশী।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে জংলা গাছ তার জংলীস্বভাব আবার ফিরে পেয়েছে।

বেড়ার সীমারেখা ছাড়িয়ে বেড়ার গাছ নেমে পড়েছে ক্ষেতে। সমস্ত শষ্যের ক্ষেত নষ্ট করে দিয়ে করে চলেছে নিজের বংশবৃদ্ধি। কাল অবধি যা ছিল শষ্যশ্যামলা এক ফলন্ত ক্ষেত, আজ তা হয়ে গিয়েছে কাঁটাগাছে ভর্ত্তি এক বন।

ঠিক কি করে যে এটা শুরু হল তা কেউ জানে না। একটা পাগলা কুকুর হয়ত এই কাঁটাগাছগুলোকে কামড়ে দিয়েছিল। আর পাগলা কুকুরের কামড় খেলে কিই বা না

হতে পারে। এ'দেশে প্রচলিত একটা গল্প আছে যে একবার একটা পাগলা কুকুর একটা চামড়ার কোটকে কামড়ে দিয়েছিল। সেই কামড় খেয়ে, লোকে সেই কোটের উপদ্রবে এমন বিরক্ত হয়ে পড়েছিল যে অবশেষে যুক্তি করে কোটটাকে গুলি করে মেরে ফেলে দেওয়া হয়। তবে এ'টা গল্পই—ঘটনা নয়। বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তবে অতি নিরীহ গাছপালা যদি পাগল হতে পারে তাহলে চামড়ার কোটেরই বা পাগল হতে বাধা কোথায় ?

শষ্যের ক্ষেতগুলো পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েও কাঁটাগাছগুলো তাদের পাগলামো থামালো না। যেখানেই একটু জমি, সেখানেই দেখা গেল গজিয়ে উঠছে এই পাগলা বুনো গাছ। শেষে যখন লোকেদের বাড়ীর চারপাশে, এমন কি রাস্তার ওপরে পর্যন্ত পাল পাল গাছ জন্মে লোকের চলাফেরা বন্ধ হবার যোগাড়—তখন সবার টনক নড়ল।

লোকেরা যুদ্ধ ঘোষণা করল এই পাগল গাছের বিরুদ্ধে। কাঁটাগাছের বনে আগুন লাগিয়ে, গাছ কেটে উড়িয়ে দিয়ে, এমন কি শেকড়শুদ্ধ গাছ উপড়ে ফেলে, সেই গাছ পুড়িয়ে দিয়ে—অর্থাৎ হাতের সামনে যা কিছু পেল তাই দিয়ে, অথবা, তাদের বুদ্ধিতে যতদূর সাধ্য তা চিন্তা করে তারা যুদ্ধ চালালো এই শত্রুর সাথে।

কিন্তু এ সব কিছুই হ'ল ভস্মে ঘি ঢালার সামিল—কিছুতেই কিছু হ'ল না। বুনো গাছের দল যেমন এগোচ্ছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই এগোতে লাগল—তাদের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই গজিয়ে উঠে। বুনো কাঁটাগাছের ঝোপ ক্রমশঃ এদের লোকদের এক একজনকে অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে লাগল।

এ'দেশের লোকেরা যখন এই কাঁটাগাছের সাথে যুদ্ধে ক্লান্ত—এবং মানুষের আশা করবার ক্ষমতাও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে—তখন দেবদূতের মতই মঞ্চে প্রবেশ করল এই শুঁয়োপোকা। সাথে নিয়ে এল তার নিজের জাতভাইদের এক সৈন্যবাহিনী। এসেই এই পোকার দল যুদ্ধ শুরু করল কাঁটাগাছেদের বিরুদ্ধে এবং এক গ্রীষ্মের ভেতরেই যেখানে যত কাঁটাগাছ আছে শুধু তাদের নয়, সেই কাঁটাগাছের শেষ বীজ পর্যন্ত এই পোকা-সেনার দল নষ্ট করে দিল।

লোকেদের আনন্দের আর সীমা রইল না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, কাঁটাগাছের বনের মধ্যে থেকে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে তাদের যে আনন্দের উৎস শুকিয়ে এসেছিল তা যেন আবার নতুন ভাবে ফিরে এল।

বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে এই 'পোকাবীর'দের অসামান্য শৌর্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য তাই এখানকার লোকেরা গড়ে তুলল এই স্মৃতিসৌধ। শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, পোকাদের প্রতি ভালোবাসা জানানোর এক স্মরণিকা হিসাবেও। সুন্দর পাথরের তৈরী এই মিনারের

গায়ে লাগানো আছে একটা ফলক। তাতে সোনার জলে লেখা রয়েছে, 'উন্মাদ কাঁটা-গাছের বনের হাত হইতে আমাদের উদ্ধার করার জন্য, উদ্ধারকর্তা পতঙ্গবীরদের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ এই মিনার গঠন করা হইল এবং ঐ জাতীয় বীরদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মিনার উৎসর্গীকৃত হইল।

তাই বলছিলাম না পোকামাকড় হেলাফেলার বস্তু নয়। আমার ত মনে হয়, এই মিনারটা যোগ্য পাত্রেই উৎসর্গ করা হ'য়েছে।

সোনার মাছ

সোনার মাছের গল্প মনে আছে ত সবার? সেই যে এক বুড়ো জেলে সারাদিন সমুদ্রে কাটিয়ে কিচ্ছুটি না পেয়ে দিনের শেষে শেষবারের মত যেই না জাল ফেলেছে—দেখে যে সোনা দিয়ে তৈরী এক মাছ, ধরা পড়েছে তার জালে। সেই সোনার মাছ আবার মানুষের ভাষায় কথা বলে। জেলেকে বলে, 'জেলে ভাই, জেলে ভাই আমাকে ছেড়ে দাও। তার বদলে আমি তোমাকে অনেক টাকাকড়ি এনে দেবো।

বুড়ো জেলে, মাছ মানুষের মত কথা বলছে শুনে খুব অবাক হল। এদিকে ওর মনটাও ছিল বড় নরম। তাই এই মাছটা সে আর ধরে ঝুলিতে পুরল না—আবার জলে ছেড়ে দিল। আর মাছটাও ছিল সমুদ্রের সব মাছেদের রাজা। কথা রাখবার জন্য মাছের রাজা পরের দিন বুড়ো জেলেকে দিল একটা নতুন বাড়ী, নতুন নৌকো আর অনেক অনেক টাকা।

যাকগে, এ'টা ত একটা রূপকথা। তবে এ দেশের লোকেরা সবাই নিজেদের বাড়ীতে একটা করে মাছ পোষে। সাধারণ দেখতে—ছোটোখাটো মাছ। কিন্তু 'মাছের রাজা' যদি কাউকে বলতেই হয় তাহলে আমি এই মাছটাকেই সেই নাম দেব। তোদের সেই সোনা দিয়ে তৈরী মাছকে—কখনও নয়।

এরা ভুলে গেছে যে এদের মধ্যে প্রথম কবে থেকে এই মাছ বাড়ীতে পোষা শুরু হয় আর এদের মধ্যে সেই প্রথম লোকটির নামই বা কি ছিল—যে এই মাছের গুণপনার কথা প্রথমে জানতে পারে? তবে এ'দেশের ইতিহাস অনুযায়ী যতদূর জানা গেছে, এই মাছ চিরকালই মানুষের বন্ধু হিসাবে কাজ করে এসেছে। না, না, এই মাছ এদেশের লোকেদের জন্য নতুন বাড়ী তৈরী করে দেয় না—তার থেকে হাজার গুণে বেশী উপকার করে। এই মাছের দয়ায় এদেশের লোকেরা নিজেদের প্রাণ বাঁচায়।

যে দেশে এত নানা ধরণের পাহাড়ের ছড়াছড়ি, সে দেশে লোকেদের জীবনযাত্রা খুব যে একটা নিরুপদ্রব হবে না তা'ত বেশ বোঝাই যাচ্ছে। যখন তখন মাটির তলায় কিছু

একটা ধুমধাড়াক্কা লেগে যায় আর সেই যুদ্ধ দেখে ওপর তলার জমি কাঁপতে থাকে, ভয়ে। আর যেই না জমির কাঁপন শুরু, অমনি গাছপালা, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, ল্যাম্পপোস্ট, ব্রীজ, রেল লাইন—অর্থাৎ মাটির ওপরে যা কিছু আছে সে সব কিছুও সাথে সাথে কাঁপতে শুরু করে। আর শুধু কাঁপাই নয়, জমির কাঁপুনি একটু জোরদার হলেই মাঝে মাঝে সবকিছু হুড়মুড় করে পড়ে যায়। তখন সে এক বিতিকিচ্ছির কাণ্ড।

এই কারণেই এদেশের লোকেরা তাদের বাড়ী তৈরী করে কাগজ দিয়ে। ইঁট পাথরের তৈরী বাড়ীর তলায় চাপা পড়ার চাইতে কাগজের বাড়ী চাপা পড়াটা বোধহয় একটু কম ক্ষতি কারক। কেউ কেউ আবার এর ওপরেও এক কাঠি। তারা বাড়ীর তলায় অনেক-গুলো লোহার স্প্রীং লাগিয়ে নিয়েছে। বোঝ ব্যাপারটা। এদিকে পায়ের তলার মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে আর বাড়ীটাও তার তালে তালে উচ্চিংড়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। তবে এ বাড়ীগুলোর একটা বড় গুণ—কক্ষণো পড়ে যায় না।

ভূমিকম্প এড়ানো যায় না, এমনকি একে বন্ধ করবার বা বাধা দেবার কোন উপায় মানুষের জানা নেই। কেউ জানতেও পারে না, কবে কোথায় কখন ভূমিকম্প হবে।

কেবল একজন ছাড়া। সে আমাদের ঘরে পোষা এই ছোট্ট মাছটি। এর অজানা কিছুই নেই। কাঁচের তৈরী নিজের ছোট্ট এ্যাকুরিয়ামে বসে সদাজাগ্রত এই প্রহরী মাটির নীচের সব খবর রাখছে। সর্বদা যখন সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে, অর্থাৎ ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নেই—তখন মাছটিও আপন মনে নিজের ঘরে সাঁতার কাটছে এধার থেকে ওধার।

কিন্তু না যেই ভূমিকম্প হবার উপক্রম হ'ল অথচ মাটি তখনও কেঁপে ওঠেনি, তক্ষুণি এই মাছের ছটফটানি বেড়ে গেল। এমনভাবে সে ছটফট করতে থাকে যে মনে হয় জল থেকে এক্ষুণি লাফিয়ে উঠে সবাইকে চেঁচিয়ে বলবে 'সাবধান, সাবধান হও। ভূমিকম্প আসছে।'

দেখতে একেবারে সাদাসিধে একটা ছোট্ট শাদা মাছ হলে কি হবে ওর এই গুণের জন্য এ'দেশের লোকেরা আদর করে এর নাম দিয়েছে 'সোনার মাছ'।

তিমির পিঠে চাপড়

দেখতে দেখতে শীত এসে পড়ল। সেদিন বাইরে খানিকটা তুষারপাতও হয়ে গেল। সেই তুষারপাতের বরফের আবার দু রকমের রং খানিকটা লাল আর খানিকটা শাদা। বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে।

আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাব জেনে সব বন্ধুরা বিদায় জানাতে আমার বাড়ী এসে

হাজির। শিকারী ব্রজদা, জাহাজী টেনিদা, ডুবুরী টেনিদার দাদা, ভূতাত্ত্বিক শিলা, সকলেই, এছাড়া নাম না মনে থাকা আরও কত বন্ধুরা।

প্রথমটায় সবাই একটু চুপচাপ। কেউ কারুর সাথে কথা বলছে না। সবাই একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে আমাকে দেখছে। বোধ হয় জীবনে আর কখনও দেখা হবে কিনা সেই কথাই ভাবছে। এই পৃথিবী কত বড়, আর কত না তার অজানা রহস্য—অজানা মানুষ।

অবশেষে নীরবতা ভেঙ্গে টেনিদা প্রথম কথা শুরু করলেন।

'আপনি একদিন আমাকে বলেছিলেন না, যে আপনাদের দেশে লোকেদের বিশ্বাস যে একবার যদি কেউ সাগর বা পাহাড়ের ডাকে সাড়া দেয়, তবে সারাজীবন ধরে সুযোগ পেলেই সে সাগরে বা পাহাড়ে ফিরে যাবে—বার বার? অনেকটা সেরকম একটা প্রবাদ আছে আমাদের দেশে। কেউ যদি একবার আমাদের দেশে এসে পড়ে, আমাদের সাথে মিলেমিশে কিছুদিন যদি থাকে—বন্ধুর মতন, তবে তাকে আবার আমাদের এই দেশে ফিরে আসতে হবে···বার বার।'

'ঠিক, ঠিক'। সমস্বরে বলে ওঠে সবাই, 'আপনাকে আবার আমাদের দেশে, আমাদের মধ্যে ফিরে আসতে হবে।'

'কত কিছুই অদেখা রয়ে গেল আপনার এদেশের।' ব্রজদা বলে ওঠেন। 'বুঝলেন মশায়, সেই যে আপনি বলতেন না যে এ'দেশে আপনি এত সব মজার জিনিষ দেখে গেলেন···অথচ আপনাদের দেশের লোক এ' সব কথা বিশ্বাসই করতে চাইবে না।'

শিলা বলে,'এ ব্যাপারে আমাদের দেশের সুন্দর প্রবাদটা ওনাকে শুনিয়ে দিই। আমরা বলি, যদি কোন মজার জিনিষ বিশ্বাস করতে চাও ত একটা তিমির পিঠে মার চড়'।

'আরে, এ প্রবাদটার কথা ত আমাদের মনেই ছিল না'। অনেকে একসাথে বলে ওঠে। 'আপনার ত আমাদের দেশের সবকিছুই খুব মজার লেগেছে। চলুন, আমাদের সাথে। একটা তিমির পিঠে চড় লাগাবেন। দেখবেন সবকিছুই কেমন সত্যি বলে মনে হচ্ছে। আর আপনার যদি—যা সব দেখেছেন, জেনেছেন তা সব সত্যি বলে মনে হয় তবে, আর আপনার কথা আপনার চেনা লোকেরা অবিশ্বাস করবে কেন?'

সবার সুরে সুর মিলিয়ে আমিও বলে উঠলাম, 'চলুন তবে তিমির কাছে'।

সত্যি আশ্চর্য বটে এই দেশটা। আমার চলে আসার সময়ও সে তার শেষ খেল দেখিয়ে ছাড়ল। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় গিয়ে কেউ একটা তিমির পিঠে চড় মারুক দেখি। অসম্ভব—তাই না? কিন্তু এখানে—যখন চাইবে—ঠিক তক্ষুণি।

সবাই মিলে আমারা একটা বরফ কাটার শাবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেশ খানিক

দূর অবধি সমুদ্র জমে গিয়েছে। বরফ জমা সমুদ্রের ওপরে খানিকটা হাঁটার পর বরফ কেটে একটা বড় মাপের গর্ত করা হল। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কিছুক্ষণের ভেতরেই সেই গর্তের ভেতরের জলে জাগল প্রচণ্ড আলোড়ন, আর তারপরের সেই গর্ত ভরে একটা তিমি মাছ তার মাথাটা গলিয়ে দিল। এ'দেশের তিমি ত—তাই এদেশের প্রবাদের মান রাখবার জন্য।

দলের সবাই পিঠ চাপড়ানোর মতো ছোট ছোট চড় মারল সেই তিমি মাছটার পিঠে। সবার দেখাদেখি আমিও। আর কি আশ্চর্য। চড় মারবার সাথে সাথেই মনে হল—যদি এ জিনিষও সম্ভব হয়—তা হলে এতদিন ধরে যা দেখেছি, যা শুনেছি সব সত্যি। আমার এদের সবকিছুতেই পুরোপুরি বিশ্বাস হয়ে গেল।

তিমি মাছটা আমাদের দিকে তাকিয়ে সবাইকে একবার ভালো মত দেখে নিল। তার পর তার নাক দিয়ে ওঠালো জলের এক বিরাট ফোয়ারা। এটাই বোধহয় তিমি মাছেদের স্যালুট জানাবার প্রথা।

খানিকক্ষণ ফোয়ারা ওঠানোর পর তিমিটা থামল। আবার আমাদের সবার দিকে তাকালো। তারপর শোঁ করে একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে মুখ নামিয়ে নীচের জলের মধ্যে আবার কোথায় যে চলে গেল, তার কোন ঠিকানা জানা নেই।

গর্তের জলও আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল।

সত্যিই, তিমির পিঠে চড় মারার অভিজ্ঞতা ভোলা যায় না। আমার ত এখন ও দেশের সব কিছুই সত্যি বলে দৃঢ় বিশ্বাস, আশায় আছি আবার কবে যাব ঐ দেশে—আমার বন্ধুদের মাঝখানে। যেখানে অসম্ভব সম্ভব হয় সাধারণ ঘটনা হয়ে ওঠে অসাধারণ। এ এক আশ্চর্য দেশ যেখানে গল্প সত্যি হয়ে ওঠে আর সত্যি ঘটনাকে মনে হয় গল্পের মত।

আমার এই কাহিনী যদি কারুর বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয় তাহলে তার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল সে প্রথমে একটা তিমির পিঠে চড় মেরে দেখুক। এর চাইতে ত আর সহজ কাজ কিছু হ'তে পারে না? তারপর দেখি তার এ গল্প বিশ্বাস হয় কি না হয়?

শেষ কথা

গল্পে গল্পে কখন দুপুর গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেছে, আমাদের কেউই খেয়াল করেনি। রামখুড়ো চায়ে চুমুক দেবার জন্য একটু থামতেই দেখি, শ্রোতার দলে শুধু আমরা ছোটরাই নেই, গল্পের গন্ধে বাড়ীর বড়রাও এসে হাজির। তাঁদেরই মধ্যে একজন অর্থাৎ আমাদের কোন গুরুজন এবার প্রশ্ন করলেন।

'আচ্ছা রামখুড়ো, আপনি ফিরে এলেন কেমন করে ?'

'খুব সোজা ভাবে। বাড়ীর দিকে যাব বলে যেই না পা বাড়ানো অমনি দেখি বাড়ী আমার সামনে। সদর দরজাটা খালি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।'

আমাদের আর এক অনেক লেখাপড়া জানা গুরুজন বলে উঠলেন, 'আচ্ছা ভুগোলে আপনার এই দেশটার কথা বলা আছে ?'

'নিশ্চয়ই'।

'এই দেশের নাম কি' ?

'সবাই একই নামে একে ডাকে'।

বাইরের আকাশে তারা জ্বলে উঠেছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে রামখুড়ো বলে চলেন।

'আকাশের দিকে দেখ। দেখ ঐ যে তারারা জ্বলছে নিভছে। আমাদের অজানা অচেনা কত অসংখ্য দেশ আছে ঐ তারার জগতে। একদেশে কোন সকাল বা বিকেল নেই আছে কেবল দিন আর রাত। আর এক দেশের একদিকে চিরকালের রাত আর অপর দিকে চিরকালের দিন।'

'নানা ধরণের দেশ, নানা ধরনের অবাক করা ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু এদের মধ্যে একটা দেশ হচ্ছে সব চাইতে আশ্চর্যের। এ'দেশের ওপরের অর্ধেক অংশে যখন গ্রীষ্ম-কাল, নীচের অর্ধেক তখন শীতে জরজর। এর একদিকে যখন ভোর হয়, আর একদিকে তখন সূর্য পাটে বসেছে, দিনের কাজ গুছিয়ে নিয়ে।'

এ'দেশের ওপর আর নীচ শাদা টুপিতে ঢাকা। এক টুপিতে গিয়ে তুমি যে দিকেই তাকাও না কেন কেবল দক্ষিণ দিক দেখবে। আর অপর টুপির চারদিকেই খালি উত্তর দিক। এ দেশে একটা বিরাট সমুদ্র আছে আর সেখানে মিলেছে পূবের সাথে পশ্চিম দিক।

'এই দেশেরই গল্প তোমাদের এতক্ষণ শুনিয়েছি।'

'এই দেশে এক ধরনের দু'পেয়ে বুদ্ধিমান জীব থাকে। তারা নিজেদের বলে মানুষ আর নিজেদের দেশটাকে বলে পৃথিবী।'

'কি-ই ?' বড়রা আর ছোটরা সবাই মিলে একসাথে চেঁচিয়ে উঠেছি। 'আপনি কি বলতে চান আপনি এতক্ষণ ধরে আমাদের যে গল্পগুলো বলেছেন তা আমাদের এই পৃথিবীর গল্প ?'

'হ্যাঁ'।

'আপনার সেই নানা রঙের সূর্য', শুকনো বৃষ্টি আর লম্বাগলা লোকেরা' ?

'হ্যাঁ, শুধু এগুলোই নয়, পাঁচশ কেজি ওজনের পয়সা, গরম জলের মাছ, পাখীর দুধ, পেরেকখোর পাখী—এছাড়া যা যা সব বলেছি তার সবগুলোই আমাদের এই পৃথিবীরই নানা জায়গার কথা।

'প্রমাণ চাই, প্রমাণ চাই।' সবার সমস্বরে দাবী।

'বেশ ত পাবে'।

'কবে, কখন ?'

'আগামী ছুটির দিন। তবে প্রমাণ কি তোমাদের ভালো লাগবে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ লাগবে লাগবে।

'বেশ তা হলে ঐ কথাই রইল'।

রামখুড়ো উঠলেন।

প্রমাণ

"বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার একটা দুঃখজনক দিক হচ্ছে,
এ প্রকৃতির রহস্যের অবগুণ্ঠণ সরিয়ে ফেলে
ছোট বড় যা কিছু রহস্যময় তাকে
সত্যের আলোকে উলঙ্গ ও রূঢ় করে তোলে।"

"কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমাদের অভিজ্ঞতা
হচ্ছে যে বাস্তব এমন অবাককরা
আশ্চর্যজনক ঘটনার সমাবেশে তৈরী, যার
কাছাকাছি কল্পনা কখনও পৌঁছতে পারবে না।"

পাতা ওল্টাবার আগে পাঠকের সাথে এক মিনিট।

এতদূর অবধি পড়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু এবার একটু ভাবো। এতক্ষণ ধরে যা কিছু পড়লে—তা' কি সব সত্যি? সত্যিই কি আমাদের এই অতি পরিচিত পৃথিবীতে এইসব ঘটনা ঘটতে পারে, না এর সব কিছুই অবাস্তব—রামখুড়োর উর্বর মাথার কল্পনা? আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর কাছে কি এত অবিশ্বাস্য রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে? বিশেষ করে আজকের এই যুগে?

তুমি যদি এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর চাও, আর সত্যিই মনে মনে স্বীকার কর যে আমাদের পৃথিবীর নানা অজানা রহস্যের মূল সূত্রগুলো খুঁজে বার করা, মহাকাশের যে কোন অচেনা গ্রহে যাওয়ার চাইতেও বেশী রোমাঞ্চকর, বেশী আনন্দদায়ক, তাহ'লেই কেবল এ পাতাটা উল্টে যাও।

দোমিনিক

শুনতে যতই গাঁজাখুরি মনে হোক না কেন, ঘটনাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে।

আমরা প্রায় সবাই জানি যে সামুদ্রিক ঈল বা 'বেড়াল' মাছের (Cat fish) দেহে একটা অসাধারণ জিনিষ আছে। আর তা হচ্ছে একটা তড়িৎ কোষ বা ব্যাটারী। এই ব্যাটারী থেকে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া যায় তা' এই সব মাছগুলোকে শিকার ধরার অন্যতম সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে। আর এই বিদ্যুতের তেজও বেশ ভালো রকমের। একজন বিজ্ঞানীর মতে দশ হাজার বৈদ্যুতিক ঈল মাছের কাছে যতটা বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায় তা' একটা ইলেকট্রিক ট্রেনকে বেশ কয়েক মিনিট ধরে চালিয়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু এ'ত গেল মাছের কথা। মানুষের শরীরেও, বিশেষ করে শীতের সময়, কখনও কখনও এতটা পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি জমা হ'তে পারে যে তখন তাদের ছুঁলেই আর রক্ষা নেই। বিখ্যাত রুশ শরীরতত্ত্ববিদ ন. ভেদেনস্কি, মধ্য রাশিয়ার টমস্ক শহরের এক নাগরিকের কথা লিখেছেন। এনার সাথে, আবহাওয়া শুকনো থাকলে করমর্দন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। শুধু ইলেকট্রিক্ শক্ খাওয়াই নয়—চট্‌পট্ শব্দের সাথে আগুনের ফুলকি পর্যন্ত ভদ্রলোকের শরীর থেকে হামেশাই বেরিয়ে আসত।

১৯৫৭ সালের ১৮ই মে, আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার এক শহরে শ্রীমতী এ্যানা মার্টিন নামে এক বৃদ্ধা হঠাৎ আগুনে পুড়ে মারা যান। অথচ ঘটনার সময়, তাঁর আশেপাশে আগুনের কোন রকম অস্তিত্বই ছিল না। কাছেপিঠে আগুন না থাকলেও ভদ্রমহিলার গায়ে কিভাবে আগুন লাগল সে রহস্য এখনও অজানা। তবে নানা ভাষ্যের মধ্যে একটা মত হচ্ছে যে, এই ভদ্রমহিলাও দোমিনিক বা টমস্ক শহরের সেই ভদ্রলোকের মত, নিজের শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ জমাতে পারতেন। আর শরীরে জমে থাকা সেই বিদ্যুৎই অবশেষে ভদ্রমহিলার গায়ে আর কাপড় চোপড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

হাঙ্গরের পিঠে

পৃথিবী বিখ্যাত ডুবুরী হানস হাসের ঠিক এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল—লোহিত সমুদ্রে। হাস, জলের তলার ছবি তুলবার জন্য একজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে নেমেছিলেন।

হাস নিজের মুখে স্বীকার করেছেন যে যতই হাঙ্গরটা ওর কাছাকাছি এগিয়ে আসছিল, ওনার ভয়ও ঠিক ততটাই বাড়ছিল। হাঙ্গরটা একটু হাঁ করে হাসের দিকে এগোচ্ছিল।

তবে যতই ভয় হোক না কেন হাঙ্গরের চোখ দেখে কিন্তু হাসের কখনই মনে হয় নি যে ওর কোন বদ মতলব আছে।

হাসের ইচ্ছা ছিল হাঙ্গরের মুখের ভেতরের ছবি তুলবার। তা সে ছবি উনি প্রাণ
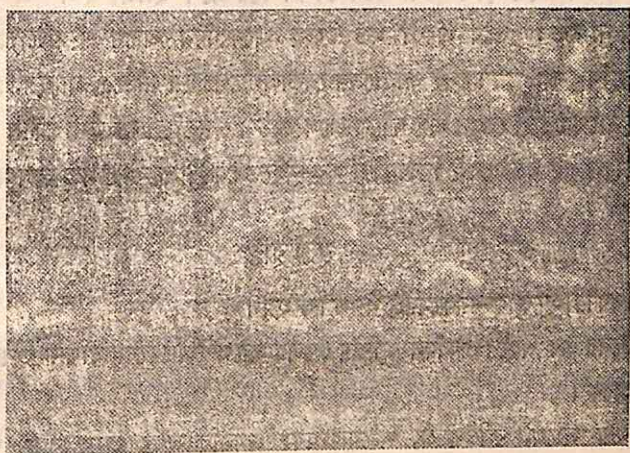
ভরে তুললেন। সেই সাথে হাঙ্গরের মুখের ভেতর যে সব ছোট ছোট মাছ থাকে—তাদের ছবিও।

কাজকর্ম শেষ করে হাস ও তাঁর সহকারী ডুবুরী, দুজনে মিলে হাঙ্গরটার পিঠে চড়ে বসলেন। হাঙ্গরটা কোন আপত্তি করল না। ছবি তোলার জন্য হয়ত ও হাসের ওপর মনে মনে খুব খুশী হয়েছিল।

জুতোর চামড়ার মত শক্ত, হাঙ্গরের পিঠের পাখনাটা চেপে ধরে হাস ও তাঁর বন্ধু চারপাশ একটু ঘুরেও নিলেন। চোদ্দ বছরের ডুবুরী জীবনে অনেক রকম অভিজ্ঞতা হাসের হয়েছে, কিন্তু এমনটি তাঁর মতে কখনও হয় নি, আর হবেও না।

হাওয়াই দ্বীপের উপকথায় আছে যে দুজন জাহাজডোবা নাবিক হাঙ্গরের পিঠে চেপে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপে এসে উঠেছিল। প্রথমে এই উপকথায় বিশ্বাস না করলেও, নিজের এই অভিজ্ঞতার পর হাস ঐ গল্পের সত্যতা সম্পর্কে কোনদিন আর কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নি।

মজন্তালীর দেশ

ভারত মহাসাগরের বুকে এক জনমানবহীন প্রবাল দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের একমাত্র অধিবাসী হ'ল, মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে বাস করা কয়েক হাজার বেড়াল। অবিশ্যি

বেড়ালগুলো এখন আর সভ্য ভদ্র নেই—সব বুনো হয়ে গেছে। রাতে ভাঁটার টানে যখন সাগরের জল সরে যায়, তখন এরা গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, সমুদ্রের পাড়ে বালির গর্ত্তের জমা জলের মধ্যে যে মাছগুলো আটকা পড়ে থাকে সেগুলোকে শিকার করে।

ওই দ্বীপে এই বেড়ালগুলো ঠিক কেমন করে এসে হাজির হ'ল—এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। তবে একটা মত হচ্ছে অনেকদিন আগে এই দ্বীপের কাছে একটা জাহাজডুবি হয়। তখন সেই জাহাজের বেড়ালগুলো হয় সাঁতরে, না হয় জাহাজের ভাঙ্গা টুকরোর সাথে ভেসে ভেসে এই দ্বীপে এসে ওঠে। যতদিন না অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় ততদিন এই মতটাকেই বিজ্ঞনীরা সব চাইতে বেশী সম্ভবপর মত বলে মনে করেন।

বৃষ্টি বৃষ্টি

পৃথিবীর বুকে কত রকমেরই না বৃষ্টি হয়।

বৃটেনের এক শহরে একদিন বৃষ্টির জলের সাথে লোকেদের মাথার ওপরে হেরিং মাছ পড়তে থাকে।

বৃষ্টির সাথে, কীটপতঙ্গ, শুঁয়োপোকা এমনকি আস্ত আস্ত ব্যাং পড়ারও খবর পাওয়া গিয়েছে। ১৯৪০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার গর্কী অঞ্চলে বৃষ্টির জলের সাথে একসাথে ঝরেছে বালি আর পুরোন তামার পয়সা। 'পয়সা বৃষ্টির' কথাটারই রকম-ফের···কি বল ?

বৃষ্টির সাথে শুধু অন্য কিছু পড়া নয়···বৃষ্টির জল নিজেও অনেক সময় খবর হয়ে গিয়েছে। জলের এই খ্যাতির কারণ হচ্ছে তার রং। পৃথিবীর বুকে কখনও বা রক্তের মত লাল রংএর বৃষ্টি ঝরেছে, কখনও বা সে দুধের মত শাদা।

এইসব বিচিত্র রংএর বৃষ্টির জন্য অবশ্য জলের কোন কেরামতি নেই। এই রংএর জন্য দায়ী হাওয়া। সমুদ্র, বন, পাহাড় প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ো হাওয়া তার চলার সাথী করে নেয় একঝাঁক হেরিং মাছ, বা একদল ব্যাং, অথবা, শুঁয়োপোকার দলকে। তারপর যেই হাওয়ার জোর যায় থেমে, অমনি সাথে বয়ে আনা সেই বোঝার পাট, অনেক দূরের দেশে সবাইকে অবাক করে নামিয়ে দিয়ে, হাওয়া মশাই আবার বেপাত্তা। বোধহয় নতুন সাথীর খোঁজে।

ঝোড়ো হাওয়া কখনও কখনও, এইসব কীট পতঙ্গের দলের সাথে বয়ে নিয়ে চলে মাটির ওপরের নরম আস্তরণ। পুরোন দিনের, হারিয়ে যাওয়া টাকা পয়সা ধন-দৌলত যা এতদিন ধরে ঐ মাটির আস্তরণের নীচে লুকিয়ে ছিলো, তারাও তার সঙ্গী হয়।

লাল রংএর বৃষ্টির মূলে আছে গেরিমাটির ধুলো, বা, খালি চোখে দেখা যায় না

এমন ছোট লাল রং এর শ্যাওলা। এরাও হাওয়ার সাথে ভেসে এসেছে বৃষ্টির কাছে। দুধশাদা বৃষ্টির জলের পেছনে আছে চকখড়ির গুঁড়ো।

শুনতে অবাক লাগলেও বৃষ্টি কখনো কখনো শুকনোও হ'তে পারে। সচরাচর মরুভূমির দেশে, যেখানে হাওয়া অত্যন্ত গরম আর তাতে জলের ভাগ খুব কম, সেখানেই এই বৃষ্টি দেখতে পাওয়া যায়। লোকে দেখতে পায় আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টিও শুরু হচ্ছে। জলের ধারা নেমে আসছে আকাশ থেকে, কিন্তু সে জল তাদের গা ভেজাচ্ছে না। তাপে, আর হাওয়ায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণের অভাবে, মাটিতে পড়বার অনেক আগেই জলের ফোঁটাগুলি আবার বাষ্প হয়ে চলে যাচ্ছে আকাশে। উজবেগিস্তান, তুর্কমেনিয়া এবং আরো অনেক জায়গায় এই ধরণের 'শুকনো বৃষ্টি' দেখা দিয়েছে।

আমাদের সবার চেনা যে বৃষ্টি, তাকেও খুব একটা সাদাসিধে লোক বলে মনে কোর না। আমেরিকার উইন্সবার্গ শহরে প্রতিবছর ২৯শে জুলাই বৃষ্টি হয়। জায়গাটা একটু খরা মত। কাজেই শহরের লোকেরাও সাগ্রহে এই বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। গত নব্বই বছরের মধ্যে একাশি বারই, বৃষ্টি তার কথা রেখে ২৯শে জুলাই দেখা দিয়েছে। কেবল নয় বার সে তার কথা রাখতে পারেনি। খুব একটা অন্যায় করেছে কি ? তোমাদের কি মনে হয় ?

ভোরবেলায়

সূর্য উঠবার আর অস্ত যাবার সময় ওর রং যে লাল বা কমলা, আর সারাদিনের জন্য ওর রং যে হলদেটে শাদা—এ কথা আমাদের সবারই জানা। কিন্তু এই পৃথিবীতেই লোকে গাঢ় বা হাল্কা নীল, এমন কি সবুজ রংএর সূর্যও দেখেছে।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী, ফ্রান্স আর ডেনমার্কের লোকেরা আকাশে দেখেছে হাল্কা নীল রং এর সূর্য। সূর্যের এই নতুন রং দেখে দর্শকেরা ত মুগ্ধ।

এই অপূর্ব দৃশ্যের মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, বহু দূরদেশে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা, যা সূর্যের এই রং পাল্টানোর পেছনে। কানাডার বনে আগুন লাগায় আকাশ হয়ে গিয়েছিল ধোঁয়ায় আর ছাইয়ের গুঁড়োয় ভর্ত্তি। ছাই মেশানো সেই ধোঁয়ার মেঘ ক্রমে ভেসে আসে পূর্বদিকে, আর এই মেঘের ভেতর দিয়ে হাল্কা নীল রংএর সূর্য দেখা দেয়।

জিব্রালটার প্রণালীর নাবিকেরা দেখেছিল গাঢ় নীল রংএর সূর্যাস্ত।

১৮৮৩ সালে, ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের পরেও নীল রংএর সূর্য দেখা গিয়েছিল।

১৮১৫ সালে ভারত মহাসাগরের তাম্বোরা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের পর কাছাকাছি জাহাজের নাবিকেরা আকাশে দেখেছিল সবুজ রং এর সূর্যকে।

এক আকাশে অনেকগুলো সূর্য—এ দৃশ্যও দেখা গিয়েছে বহুবার। খুব ঠাণ্ডা পড়লে পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের দেশের লোকেরা সচরাচর আকাশে একসাথে তিনখানা সূর্য দেখতে পায়। অবশ্য এর মধ্যে যে একটাই কেবল আসল সূর্য—আর অন্য দুটো তার প্রতিবিম্ব মাত্র—তা নিশ্চয়ই তোমাদের বলে দিতে হবে না। এই দৃশ্যকে আদর করে ঐ সব দেশের অধিবাসীরা বলেন, 'সূর্যের কান বেরিয়েছে'।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, হাওয়ায় জলীয় বাষ্প অনেক সময় বরফে জমে যায়, আর সেই হাওয়ায় ভাসা ছোট ছোট বরফ কণার ভেতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণ—এটাই এই অপূর্ব দৃশ্যের মূলে। তোমাদের মধ্যে যারা আলো নিয়ে লেখাপড়া করছ তারা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটার মূল সত্যটা ধরতে পারছ।

১৮৬৮ সালের ৯ই এপ্রিল সোভিয়েত রাশিয়ার উরাল পর্বতের ওপরে আটখানা সূর্য দেখা গিয়েছিল।

পরের দিন

ব্রহ্মদেশে এক জাতের আদিবাসী আছে, যারা নিজেদের বলে 'পালোং' বা 'লম্বা গলা'। এদের মেয়েরা সব্বর্দা, মোটা মোটা পেতলের রড দিয়ে গোল করে তৈরী করা একটা খাঁচা গলায় পরে থাকে। পাঁচ বছর বয়স হলেই মেয়েদের গলায় এই পেতলের খাঁচার প্রথম গোল শেকলটা পরিয়ে দেওয়া হয়। আর খাঁচার শেষ শেকলটা পরানো হয় মেয়েটির বয়স যখন এগারো।

এই খাঁচার দৌলতে ঐ এগারো বছর বয়েসেই মেয়েটির গলা প্রায় কুড়ি সেণ্টিমিটার লম্বা হয়ে গেছে। বয়েসকালে এই গলার দৈর্ঘ্য গিয়ে দাঁড়াবে তিরিশ বা চল্লিশ সেণ্টি-মিটারে। এদেশের লোকেদের বিশ্বাস যে মেয়েদের গলা যত লম্বা হবে, ততই তাদের রূপ খুলবে। আর, যার গলা যত লম্বা তার ভাগ্যও ততই ভালো।

পালোংদের কাছে পেতল খুবই দামী ধাতু। কাজেই দিনে বা রাতে পালোং মেয়েরা কখনই তাদের গলার বা গায়ের গয়না খোলে না। অবিশ্যি খুলতে চাইলেও তার উপায় নেই। খুব অল্প বয়স থেকে গয়না পরে পরে তাদের গলার পেশীগুলি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, যে ঐ খাঁচার সাহায্য ছাড়া শুধু গলা ওদের মাথার ওজন সামলাতে পারবে না।

পালোং মেয়েরা শুধুমাত্র যে গলায় পেতলের গয়না পরে তা নয়। শরীরের যেখানে সেখানে—অর্থাৎ হাতে পায়ে এমনকি পেটের ওপর পর্যন্ত তারা গয়না পরে। আর গয়নাগুলোর ওজনও কম নয়। একজন মেয়ের গায়ের সব গয়নার ওজন দশ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

এস্কিমোদের শুভেচ্ছা জানানোর প্রথা হচ্ছে নাকে নাক ঠেকানো।

গ্রীষ্মপ্রধান কতগুলো দ্বীপে এক ধরণের বিশাল মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। এই মাকড়সাগুলোর খ্যাতি তাদের স্বাস্থ্য আর তাদের বোনা জালের শক্তির জন্য। এই জালগুলোর এক একটা সুতোর ব্যাস এক মিলিমিটারের দেড়শ ভাগের এক ভাগ হলে কি হবে, এই সুতোতেই এরা আশি গ্রামের মত ওজন ঝোলাতে পারে। আর যদি এই সুতো নিয়ে টানাটানি কর, তাহলে নিজের দৈর্ঘ্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ অবধি না ছিঁড়ে লম্বায় বাড়তে পারে।

দ্বীপের বাসিন্দারাও এই মাকড়সার জালের উপকারিতা সম্পর্কে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল। যেখানে মাকড়সাটা তার জাল বুনছে, সেখানে বাঁশ দিয়ে তৈরী করা মিটার দেড়েক ব্যাসের একটা রিং ফেলে দিলেই কিছুক্ষণের মধ্যে মাকড়সাটা তার জাল দিয়ে ঐ রিংটাকে ভালোভাবে ঢেকে দেবে। ব্যাস্, তৈরী হয়ে গেল মাছ ধরার জন্য একটা খুব সুন্দর খেপলা জাল। এতে সোয়া কেজি পর্যন্ত ওজনের মাছ ধরতে কোন কষ্টই নেই। এই মাকড়সার জাল দিয়ে তৈরী করা ফাঁদে প্রজাপতি, পাখী এমনকি বাদুড় পর্যন্ত ধরার কথা শোনা গিয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের জেলেরা এই মাকড়সার জাল লাগিয়ে নেয় কাঠের ফ্রেমের ওপরে। তারপর পিঁপড়ের টোপ ভরে এই জালগুলোকে ভাসিয়ে দেয় নদীর বুকে। পিঁপড়ের লোভে একবার এই জালে ঢুকলেই মাছের দফারফা আর জেলেদের আনন্দ।

এই জাল আবার জামাকাপড় বুনবার সুতো হিসাবেও ব্যবহার করা হয়।

চীনে এই মাকড়সার তৈরী সুতো দিয়ে এক ধরনের কাপড় তৈরী করা হয়। এগুলো দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি টেঁকসই। ইউরোপেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত খুব দামী, টেঁকসই আর অপূর্ব সব দেখতে জামাকাপড় এইরকম সুতো দিয়ে তৈরী হ'ত। এই
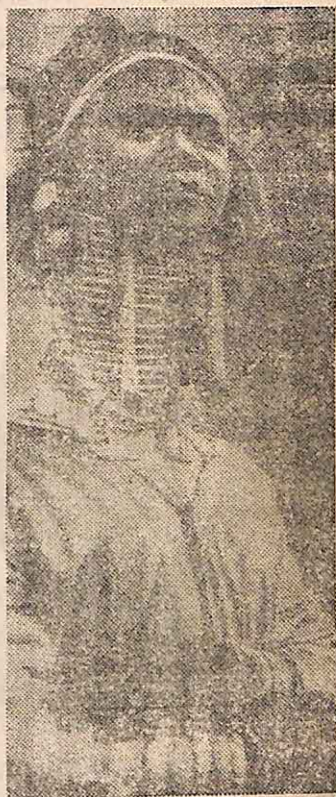
কাপড়গুলোর দাম ছিল খুব বেশী। আর বেশী হওয়াই ত স্বাভাবিক। প্রথমতঃ অতগুলো মাকড়সা যোগাড় করা। তারপর সেগুলোকে ঠিকঠাকভাবে খাইয়ে দাইয়ে তোয়াজ করে রাখা—যাতে তারা মন দিয়ে জাল বুনতে পারে—একি কম খরচের কথা? কাজেই এক একটা এই জালের জামার পেছনে যতটা মেহনত করতে হ'ত, ততই বেশী হ'ত তার দাম।

মাকড়সার জালের ওপর ছবি আঁকা কিন্তু অনেকদিন ধরেই বহু শিল্পীর জানা। জল মেশানো দুধের ভেতর এই জাল কিছুক্ষণ চুবিয়ে রাখলেই হয়ে গেল—একেবারে তৈরী ক্যানভাস। তখন এই ক্যানভাসের ওপরে চাইনিজ ইংক এর মত কোন পাকা কালি দিয়ে ছবি আঁকলেই হ'ল। তবে এই মাকড়সার জালের ক্যানভাসে আজ পর্যন্ত যত ছবি আঁকা হয়েছে তা' সবই ছোট সাইজের—এ ক টা পোষ্টকার্ডের মাপের চাইতে বড় নয়। ও হো বলতে ভুলে গিয়েছি, এই ছবি আঁকবার জন্য তুলিগুলি কিন্তু কদো খোঁচা পাখীর পালক দিয়ে তৈরী হতে হবে।

আমাদের জানা ইতিহাস অনুযায়ী মাকড়সার জালের ওপর আঁকিয়ে প্রথম খ্যাতনামা শিল্পী হলেন ইতালীর দক্ষিণ টাইরলের শিল্পী এলিয়াস প্রুণার। আধুনিক কালে, ভিয়েনাতে অষ্ট্রিয় শিল্পী জাষ্টিনাস সোদানের প্রদর্শনীতেও মাকড়সার জালের ওপর আঁকা ছবি দেখানো হয়েছে।

শহরে

এখনও জাপানের কিছু জায়গায়, অর্থাৎ যেখানে ভূমিকম্প প্রায় একটা নিত্ত নৈমিত্তিক ঘটনা, সেখানে বাড়ী তৈরী হয় কাগজ দিয়ে। তবে বাড়ী তৈরীর কাগজটা একটু মোটা ধরণের।

সোভিয়েত রাশিয়ার আস্কাবাদ শহরে ইস্পাতের স্প্রীং এর ওপর বসানো একটা বাড়ী আছে। ছোটখাটো ভূমিকম্প হলে বাড়ীটা দুলে ওঠে ঠিকই, তবে স্প্রীং থাকার জন্য

হুড়মুড় করে পড়ে যায় না। আর অল্প-স্বল্প দোলা, বাড়ীর লোকেদেরও গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। তারাও বাড়ির এই নাচন গ্রাহ্য করে না।

দক্ষিণ আমেরিকার অনেক জায়গায় এখনও মেয়েরা ফ্যাশন করে কানের দুলের বদলে অ্যাকুরিয়াম ঝোলায়। তবে এগুলোর সাইজ কানের দুলের মতই। আমাদের জানা অ্যাকুরিয়ামের মত ঢাউস নয়। স্ফটিকের তৈরী স্বচ্ছ এই অ্যাকুরিয়াম দুলগুলির ভেতর ভরা থাকে সত্যিকারের জল আর তাতে জ্যান্ত মাছেরা খেলা করে বেড়ায়। পিঁপড়ের মত এই ছোট ছোট মাছগুলোকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'পান্ডাচা' (Pandacha)।

বিস্কে উপসাগরের ফরাসী দ্বীপ রে-তে চারপেয়ে সব গাধাই ফুলপ্যান্ট পরা। ফুল-প্যান্টগুলোর নক্সা হয় ডোরাকাটা নয়ত বুটিদার। আসলে, এককালে এই দ্বীপটা ছিল শুধু জলাতে ভর্ত্তি আর সেই জলার জলে জন্মাত অসংখ্য মশা। এই মশাদের হাত থেকে গাধাদের বাঁচাবার জন্যই, প্রথমে ওদের ফুলপ্যান্ট পরানো আরম্ভ হয়। এখন অবিশ্যি আর মশা নেই, কিন্তু গাধাপ্যান্টের নিয়মটা চালু রয়েছে এখনও।

শুধু বেজিং নয়, চীনের অনেক শহরের রাস্তায় রাস্তায় এখনও বহু ফিরিওয়ালা দেখতে পাওয়া যায়, যাদের কাঁধে রাখা লম্বা বাঁশের দুদিক থেকে নানান ধরনের ছোট ছোট খাঁচা ঝুলছে। তবে এইসব খাঁচার ভেতর বুলবুলি, ময়না বা গান গাওয়া কোন পাখী নেই। খাঁচা ভর্তি শুধু পোকামাকড়…অনেকটা আমাদের ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত। লোকেরা এই পোকার আওয়াজ শুনতে খুব পছন্দ করে। তাই এদের বিক্রিও বেশ ভালোই। এই গাইয়ে পোকারা খেতে পছন্দ করে তরমুজের শাঁসটুকু। প্রিয় গায়কের গানের গলা ঠিক রাখবার জন্য এইটুকু ব্যবস্থা—লোকে আনন্দের সাথেই করে।

বাঁধানো দাঁত কেবল মানুষের জন্যই নয়, গরুর জন্যও তৈরী হয়। তোমরা ত জানই দাঁত ভালো রাখা, ভালো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ কথাটা কেবল মানুষের ব্যাপারেই নয় গরু মহিষের স্বাস্থ্যের সম্পর্কেও বলা যেতে পারে। যে কোন পশু চিকিৎসককে প্রশ্ন করলে জানতে পারবে যে দাঁত ভালো থাকলে গরু দুধ দেয় বেশী করে। কোথাও কোথাও এক একজন পশু চিকিৎসকের চিকিৎসায় কয়েক হাজার গরু থাকে। তাদের চিকিৎসার সাথে সাথে চিকিৎসকের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে, এইসব গরুদের দাঁত ভালো রাখা।

শুধু যে আমাদের বয়েসের সাথে আমাদের দেহের উচ্চতার পরিবর্ত্তন হয়, তা নয়। আসলে সারাদিন ধরেই আমাদের দেহের দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে সারারাত ঘুমানোর পর সকালবেলা যখন আমরা উঠি তখন আমাদের উচ্চতা থাকে সবচাইতে বেশী। সারাদিন ধরে আমাদের এই দৈর্ঘ্য অবিশ্যি কমতে থাকে।

বিকেলবেলা আমাদের দৈর্ঘ্য হয়ে যায় সকালবেলার মাপের চাইতে প্রায় আঠারো উনিশ মিলিমিটার কম। খুব হাঁটাহাঁটি করলে বা খুব বেশী পরিশ্রম করলে, বিকেলবেলায় আমরা সকালের চাইতে পঁয়ষট্টি এমন কি সত্তর মিলিমিটার অবধি বেঁটে হয়ে যেতে পারি।

এই দৈর্ঘ্য কমার মূলে হচ্ছে আমাদের মেরুদণ্ড। পরিশ্রম করলে এই মেরুদণ্ড যে সব কোমলাস্থি দিয়ে তৈরী, তার ওপরে চাপ পরে, আর তাতে এই কোমলাস্থিগুলো সংকুচিত হয়ে আসে। তাই দিনের শেষে আমরাও বেশ খানিকটা বেঁটে হয়ে পড়ি।

গাছগাছালি

পৃথিবীর কেবল এক জায়গাতেই চৌকো গুঁড়ির গাছ দেখতে পাওয়া যায়—তা হচ্ছে পানামা দেশে। এদেশে এই চৌকো গাছের বয়েস, রামখুড়ো ঠিক যেমন বলেছেন, তেমনি গাছের ভেতরের রিং দিয়ে নয়, ভেতরের বর্গক্ষেত্রগুলো গুণে গুণে বার করা হয়।

বিশাল গাছ বহু দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে এদের মধ্যে সবচাইতে নামডাক হ'ল ভারতীয় বটগাছের। বটের ঝুরিগুলো শাখাপ্রশাখা থেকে মাটিতে নেমে এসে ক্রমে গুঁড়ির রূপ নেয়—অর্থাৎ শেকড়সমেত এটাও মূল গাছটার জন্য খাবার যোগাড় করে।

একটা বটগাছ প্রায় তিরিশ মিটার মত উঁচু হয় আর চওড়ায় প্রায় অনন্তকাল ধরে

বাড়তে পারে। ছশ মিটার পরিধি—এ রকম বটগাছের দেখা পাওয়া গিয়েছে, আমাদের এই দেশেতেই।

এছাড়া আরও কত যে বিচিত্র রকমের গাছ আছে আমাদের এই পৃথিবীতে, তার আর ইয়ত্তা নেই। যেমন ধর পান্থপাদপ। মাডাগাস্কারের এই গাছগুলো অনেকটা আমাদের তালগাছের মত দেখতে। তবে এদের পাতার গোড়ার দিকটা ফাঁপা আর তার মধ্যে ওরা থাকে তৃষ্ণার্ত পথিকের জন্য মিষ্টি ঠাণ্ডা জল।

পৃথিবীর সবচাইতে লম্বা গাছ হল প্রশান্ত মহাসাগর উপকুলের 'রেড উড' গাছ। এরা প্রায়ই একশ পাঁচ মিটার অবধি লম্বা হয়। আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ায় এই গাছের একটা বেশ বড় বন আছে।
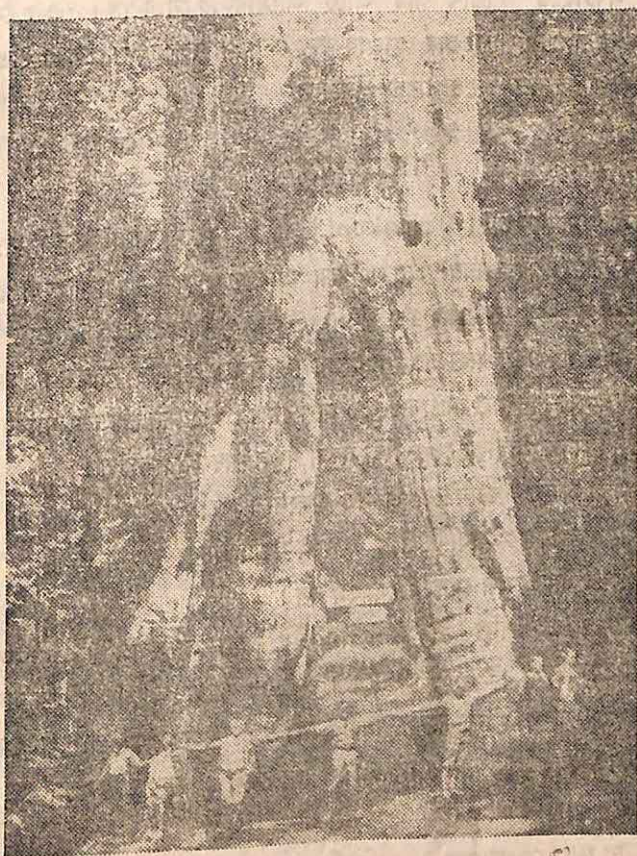
এই রেড উড গাছেরই নিকট আত্মীয় 'সেকুইয়া' গাছ থেকে প্রতি গাছ পিছু সব-

চাইতে বেশী কাঠ পাওয়া যায়। নব্বই মিটার লম্বা আর চব্বিশ মিটার পরিধি—এই সাইজের সেকুইয়া গাছ এদের পরিবারের একজন অতি সাধারণ সদস্য। তবে দুঃখের কথা হল যে এরা খুব মিশুকে গাছ নয়—একেবারে ঘরকুণো। তাই এদের দেখতে হলে তোমাকে ক্যালিফোর্ণিয়ার সিয়েরা নেভাদা অঞ্চলেই যেতে হবে। অন্য কোথাও গেলে দেখা পাবে না।

তবে কেউ যদি শুধু মোটাসোটা গাছই কেবল পছন্দ করে তবে তাকে খুঁজতে হবে মেক্সিকোর জলাগুলো। এখানেই আছেন পৃথিবীর সবচাইতে মোটা গুঁড়ির গাছ। তাঁর নামটাও চেহারার সাথে মানানসই—'এল জায়গাণ্টে'। এর গুঁড়ির পরিধি পঁয়তাল্লিশ মিটার। খুব একটা লম্বা না হলেও স্বাস্থ্য বেশ ভালোই বলতে হবে।

পৃথিবীর সবচাইতে পুরোণ গাছ আছে আমেরিকার নেভাদায়। এটা দেবদারু জাতের গাছ। বয়স প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর। কথা বলতে পারলে এ ইতিহাসের অনেক অজানা খবর জানিয়ে দিতে পারত—কি বল?

পাহাড় পথে

১৯৫৫ সালে 'বারেণকফ্' (Barenkopf) বা 'ভালুকের মাথা' নামে পাহাড়টি হঠাৎ প্রতিদিনে প্রায় এক মিটার করে এগিয়ে আসতে থাকে। বোঝা গেল যে এই পাহাড়ের লক্ষ্য কাছের 'গুণসেসরাইড' (Gunzesried) গ্রামের দিকে। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে জার্মানীর এই পাহাড়টি নিয়মিতভাবে এগিয়ে আসতে লাগল। তার এই অগ্রগতির ফলে চারপাশের সমস্ত রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গেল। গ্রামের ক্ষেত খামারের মাঝে গজিয়ে উঠল নতুন নতুন পাহাড়, দেখা দিল নতুন নতুন খাদ আর ফাটল।

এ রহস্যের মূল কারণ বিজ্ঞানীদের এখনও অজানা। তবে গবেষণা চলছে।

আমাদের এই পৃথিবীকে সাধারণভাবে দেখলে যতটা চিরন্তন আর অপরিবর্তনশীল বলে মনে হয় আসলে কিন্তু সে মোটেই সেরকম নয়।

১৮৮০ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত—জার্মানীর শহর লুনেবার্গ (Luneberg) নিয়মিতভাবে মাটির নীচে ডুবে যেতে থাকে। ১৯৫১ সালে লুনেবার্গ এর অবস্থিতি ১৮৮০ সালে যেখানে ছিল তার থেকে দু মিটার নীচে। শহরের এই পাতাল প্রবেশের সাথে সাথেই অনেক ঘরবাড়ীও মাটির নীচে চলে গিয়েছিল। আর তার ফলে বহু লোক শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

জোয়ার-ভাঁটার ফলে কেবল জল নয় পৃথিবীর স্থলভাগেরও নানা পরিবর্ত্তন আসে। আমরা সবাই জানি পৃথিবীর জলকে চাঁদের আকর্ষণের ফল হচ্ছে জোয়ার ভাঁটার মূল

কারণ। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে মস্কো শহরের আশেপাশের কিছু জায়গাও জোয়ারের সময় প্রায় তিনশ মিলিমিটার অবধি উঁচু হয়ে ওঠে।

জোয়ার ভাঁটা ছাড়াও পৃথিবীর ওপরের কোন জায়গার পরিবর্তন অনেক বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এই কারণগুলোর নীট ফল অবশ্য—কোন জায়গার আগের চাইতে উঁচু হয়ে ওঠা অথবা কোন জায়গা আগের চাইতে বেশ খানিকটা নীচু হয়ে পড়া। সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে যে কোন কোন জায়গার শহরতলি, প্রতি বছর দু মিলিমিটার করে মাটির নীচে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার তেমনি কতগুলো শহর বছর বছর উঁচু হয়ে উঠছে প্রায় চার মিলিমিটার করে।

কিন্নর কণ্ঠী গুগলী

মাছ যদি কথা কইতে পারে, তাহলে গুগলী বা শামুক কি দোষ করল ?

ফ্রান্সের বার্গাণ্ডী প্রদেশে এক ধরণের শামুক পাওয়া যায়। এরা সারা শীতের হিমানী আর গরমের খরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু যেই আকাশে দেখা দেয় বর্ষার ঘনঘটা আর, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ছুটে আসে গরম পৃথিবীকে ঠাণ্ডা করতে, অমনি তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে গান গাইতে শুরু করে।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এটা, এই শামুকদের গান বলে মেনে নিতে রাজী নন। তাঁদের মতে এটা ওদের ডাক মাত্র। তবে আমরা এই শামুকের ডাককে বর্ষামঙ্গলের আবাহনী গান বললে, খুব একটা অন্যায় হবে কি ?

নতুন বাড়ী

উইপোকার ঢিপি আমাদের প্রায় সবারই দেখা জিনিষ। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ-গুলোতে প্রায়ই এই ঢিপিগুলোর চেহারা হয়—প্রায় ছ'মিটার উঁচু আর সেরকমই চওড়া। উইপোকারা এগুলো তৈরী করে মাটি দিয়ে। এই রকম তৈরী করা বাড়ীর ভেতরে একজন মানুষ বেশ সহজেই থাকতে পারে। রোদ বা বৃষ্টি—কিছুর জন্যই আর কোন চিন্তা নেই। অবশ্য যদি বাড়ীর আদি বাসিন্দারা নিজেদের তৈরী করা বাড়ী ছেড়ে দিয়ে যায় বা তাদের অন্য কোন উপায়ে তাড়িয়ে দেওয়া যায়—তবেই এটা সম্ভব।

নানা রকমের পতঙ্গভুক গাছ আছে এই পৃথিবীতে। এদের একমাত্র কাজ হ'ল ফাঁদ পেতে পোকামাকড় ধরা। অবশ্য এই পোকামাকড় ধরে একমাত্র খাবার উদ্দেশ্যে। জলায় জন্মায় এমনি একটি গাছের নামও বেশ কবিত্বপূর্ণ—'সূর্যের শিশির' (Sun-dew)। এই সূর্যের শিশির গাছের সুন্দর দেখতে একটা পাতার ওপর যেই না একটা পোকা এসে বসেছে, অমনি প্রায় লজ্জাবতী গাছের পাতার মতই এই গাছের পাতাও

গুটিয়ে যায়। কেবল একটু তফাৎ আছে। সূর্যের শিশিরের পাতার ভেতর পোকাটা আটকা পড়ে থাকে। পোকাটার সমস্ত রস শুষে নেবার পর যখন ওটা শুকনো ছিবড়ে
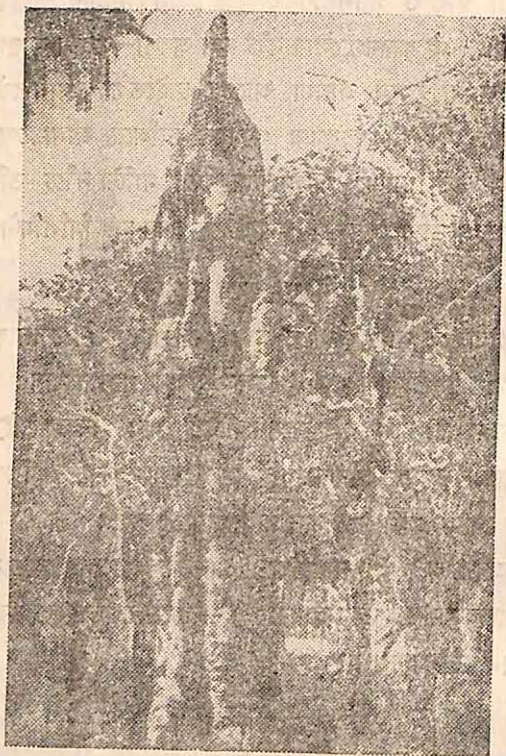
হয়ে গেছে, তখন গাছ মশাই আবার নতুন খাবার ধরার আশায় ভালো মানুষের মত নিজের পাতার বাহার খুলে বসেন।

অষ্ট্রেলিয়ার বনে জঙ্গলে বসন্ত আর শরৎকালে এক ধরণের ব্যাংএর ছাতা গজিয়ে ওঠে। এই ছাতাগুলোর একটা বিশেষ গুণ আছে—এদের নিজেদের আলো আছে। কয়েকটা ব্যাংএর ছাতা একত্র করলে যা আলো পাওয়া যায় তাতে বই পড়া স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

ব্রাজিলের বনে দেখা পাওয়া যায় 'ঘোমটা টানা সুন্দরী' (Veiled Lady) নামে এক ধরণের বিশাল ব্যাংএর ছাতার। এই সুন্দরী জন্মানোর দু ঘণ্টার মধ্যে পাঁচশ মিলি-মিটার অবধি লম্বা হয়ে যেতে পারেন। এনার মাথার ঘোমটার ছাতা থেকে রাতে বার হয় এক ধরণের উজ্বল সবুজ রংএর আলো। আর এই আলোর জন্যই বনের যত জোনাকি আছে সব এসে জমায়েত হয় সুন্দরীর আশেপাশে।

এরা ছাড়াও আরও অনেক রকমের প্রাথমিক স্তরের গাছপালা আছে যারা রাতে আলো দিতে পারে।

ব্রাজিল এবং ভেনিজুয়েলায় 'সম্রাট বোয়া' (Emperor Boa) নামে এক ধরণের ময়াল সাপের আস্তানা। এরা দেখতে বেশ সুন্দর আর লম্বায় প্রায় চার, সাড়ে চার মিটার। এই সাপেদের বা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের, খামার গুদাম, এমনকি কখনো কখনো বাড়ীতেও রেখে দেওয়া হয়, আশেপাশের বা আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা ইঁদুর ধরবার জন্য। ঘরের পোষা বেড়ালটির মতনই এই সাপগুলোও এত ভালোভাবে বাড়ী ও বাড়ীর লোকজনকে চিনে যায় যে, এদের অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে গেলেও এরা ঠিক বাড়ী চিনে ফিরে আসবে। এদেশে তাই বাড়ী বিক্রির সাথে সেই বাড়ীর পোষা ময়াল সাপটাও একসাথে বিক্রি করা হয়।

উড়ুক্কু কুকুর আর উড়ুক্কু শেয়াল হচ্ছে ভারতবর্ষ, নিউ গিনি আর অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। এদের কুকুর বা শেয়াল যাই নাম দেওয়া হোক না কেন আসলে এরা বাদুর শ্রেণীর জীব। খুব বড়সড় আর কুৎসিৎ দেখতে এই বাদুরগুলো কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিরামিশাষী আর অধিকাংশ সময়েই ফলভুক্। রাত্রে দলবল সাথে করে এরা আমবাগান বা কলাবাগানে ঢুকে সমস্ত ফল খেয়ে শেষ করে দেয়। কখনও কখনও ডুমুর গাছের ওপরেও এদের হামলা চলে। দিনের বেলা এরা অবিশ্যি অন্য সব বাদুরদের মতই কোন গাছের ডাল থেকে নীচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে ঘুমোয়।

অবশ্য সব জাতের বাদুড়ই কিন্তু এই বাদুড়গুলোর মত সাত্ত্বিক নয়। এদেরই এক জাতভাই আছে যাদের প্রধান খাবার হচ্ছে পাখী বা পশুর রক্ত। তা সেই পাখী বুনো

বা পোষা যাই হোক না কেন। খিদের সময় হাতের কাছে খাবার না পেলে এরা অনেক সময় মানুষকেও আক্রমণ করেছে। এদের রক্ত খাবার প্রধান উপায় হচ্ছে কামড়ে চামড়া ফুটো করে দেওয়া আর সেই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত চেটে চেটে খাওয়া, আর এই থেকেই ত জন্ম নিয়েছে নানা উপকথার।

বুনো হাঁসের রাখালি

এককালে উত্তর আমেরিকা ছিল বুনো সারসের লীলাভূমি। কিন্তু সে অনেককাল আগের কথা।

ক্রমে উত্তর আমেরিকাতে যতই বসতি বাড়তে শুরু করল, ততই বাড়ল জমির চাষ। বুজিয়ে ফেলা হ'ল সবগুলো জলা।

কিন্তু এতেও মানুষ থামল না। খেলার নামে তারা পাখী মারতে শুরু করল হাজারে হাজারে, চুরি করল পাখীর বাসা থেকে অসংখ্য ডিম। ক্রমে—এমন একটা সময় এল যে সারসের সংখ্যা একশর'ও নীচে নেমে গেল।

আজ অবশ্য আমেরিকার লোকেদের হুঁস হয়েছে। বুনো সারসদের এখন দিনরাত, চব্বিশঘণ্টা দেখভাল করা হয়। এখন একদল সারস শীতের শুরুতে যখন তাদের এতদিনের বাড়ী কানাডার জলাভূমি, ছেড়ে গরম দেশ দক্ষিণ টেক্সাস বা লুজিয়ানার দিকে রওয়ানা হয়, তখন তাদের রাখালি করবার জন্য সারসের দলের পেছন পেছন ওড়ে স্পেশাল এক এরোপ্লেন। এই রাখালি আজও চলে আসছে। যতদিন না সারসগুলো সংখ্যায় এত বেশী বেড়ে ওঠে, যাতে তাদের অস্তিত্ব আবার বিপন্ন হয়ে পড়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকবে না, ততদিন পর্যন্ত এই রাখালি চলবে।

আমেরিকায় শুধু পাখীর রাখালই নয় পাখীর জন্য চৌকিদারও আছে।

১৯০৭ সালে মেইন উপসাগরের কূলে চোরাপাখী শিকারীদের গুলিতে আইডার হাঁসের বংশ যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার অবস্থা, তখন এই দুর্মূল্য পাখীগুলোকে বাঁচাবার জন্য ওদের বাসার কাছাকাছি এক চৌকিদারির ব্যবস্থা করা হয়। এই চৌকিদারদের কাজ ছিল, কেউ আইডার হাঁস শিকার করলেই তাকে গ্রেপ্তার করে সোজা জেলে পুরে দেওয়া। আইডার হাঁস বাঁচাবার জন্য এই চৌকিদারির ব্যবস্থা আজও চলছে পুরোদমে।

কাঠের গরু

ল্যাটিন আমেরিকার বহুদেশে খুব সুন্দর দেখতে আর চকচকে পালিশ করা চামড়ার মত পাতাওয়ালা এক গাছের বাগান দেখতে পাওয়া যায়। এদের ফলগুলো হয় ছোট ছোট কিন্তু রসে ভর্ত্তি আর ফলগুলোর মধ্যে কোন আঁটি থাকে না।

এদেশের লোকেরা কিন্তু এই ফলের জন্য এই গাছকে এত কদর করে না। এই গাছগুলোকে আদর করে ডাকে 'গরু' গাছ বা 'দুধের' গাছ বলে। এই গাছের চামড়া একটু চিরে দিলেই শাদা বটের আঠার মত ঘন দুধ গাছ থেকে ঝরতে থাকে। গাছ 'গরু'র কাছ থেকে একদিনে প্রায় চার পাঁচ লিটার অবধি দুধ পাওয়া যেতে পারে। স্বাদে বা গুণগত মানে এ দুধ, গরুর দুধের থেকে প্রায় অভিন্ন। অবিশ্যি কেউ কেউ এই দুধের স্বাদকে একটু তেতো তেতো বলেছেন। তবে জল দিয়ে দুধটা একটু ফুটিয়ে নিলেই তেতো ভাবটা একেবারে—ভ্যানিশ্।

কেবল 'গরু' গাছই নয়, পৃথিবীতে আরও অনেক রকম মজার গাছ আছে। যেমন 'পাউরুটি গাছ' বা 'সসেজ' গাছ। 'রুটিগাছের ফল একটু সেঁকে নিলেই একদম তৈরী
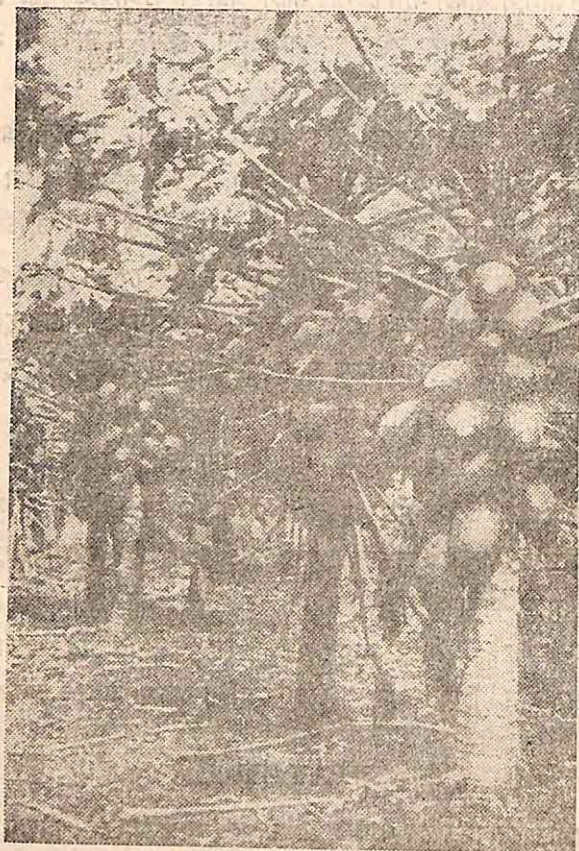
রুটি। খেতেও বেশ সুস্বাদু। 'সসেজ' গাছের ফল দেখতে যদিও ঠিক দোকানে বানানো সসেজের মত, তবে, এই সসেজ মানুষ খেতে পারে না।

পাখীর দুধ

দুধ তৈরী করতে পারে এমন কোন মাংসগ্রন্থি পৃথিবীর কোন পাখীরই নেই। আর এই গ্রন্থি না থাকলে কোন জীবের দেহে দুধ তৈরীই হ'তে পারে না। অথচ পাখীর দুধ হয়।

ডিম ফুটে বেরোবার পর প্রায় আঠারো দিন ধরে আমাদের ঘরে পোষা অত্যন্ত চেনা-জানা পায়রার বাচ্চারা, তাদের বাবা মা'দের অর্ধেক হজম করা আর জাবর কেটে বার করা

এক ধরণের খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। এই খাবারটা দেখতে শাদা আর খুব পাতলা কাদার মত। এটাকে বলা হয় পায়রার দুধ (Pigeon's Milk)।

সুদূর কুমেরুর অধিবাসী পেঙ্গুইন পাখীও নিজের ছেলেমেয়েদের এইভাবে দুধ তৈরী করে খাওয়ায়।

তবে এই পাখীর দুধ, গুণগত মানের দিক দিয়ে বা স্নেহ পদার্থের শতকরা ভাগের হিসেবে, গরুর দুধের চাইতে অনেক ওপরে। তিমি মাছের দুধও খুব পুষ্টিকর। এই দুধে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ, গরুর দুধের চাইতে বারো গুণ বেশী।

রামখুড়োর দুধের ওপরে দেওয়া অন্যান্য তথ্যগুলোও সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক সত্য।

চোর পুলিশ

লোকের বাড়ীতে চুরি করার জন্য চোরেদের বুদ্ধির দৌড় দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

ভারতবর্ষে এককালে চোরেরা, দেয়াল বেয়ে উঠবার জন্য 'ভাম' নামে এক ধরণের সরীসৃপের সাহায্য নিত। ভাম হচ্ছে খাটাশ বা গিরগিটি ধরণের একজাতীয় জীব। তবে ওদের সাইজগুলো হয় বিশাল। প্রায় দেড় মিটার লম্বা।

এখন চোরমশাই ভামের কোমরে একটা লম্বা দড়ি বেঁধে দিত তাকে দেয়ালের গায়ে ছেড়ে। ভামটাও দেয়াল বেয়ে উঠে বেশ পছন্দসই একটা ফাটল বা খোলা জায়গা পেলেই সেখানে চুপচাপ বসে পড়ত। এদিকে চোরও যেই দেখল যে দড়ির আর কোন নড়াচড়া নেই তখন সে ঐ দড়ি বেয়ে উঠতে লাগত। ভামটাও দেয়ালের গা এমন শক্ত করে ধরে থাকত যে চোরটার ভারও তাকে কাবু করতে পারত না। চোর দড়ি বেয়ে বাড়ীর জানালায় বা ছাদে সহজেই উঠে যেত।

কিন্তু চোরেরাই কেবল বুদ্ধিমান নয়। গৃহস্থও সমান সজাগ।

অস্ট্রেলিয়ার লোকে অনেক সময় চোরের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বাড়ীতে বা দোকানে সাপ পোষে। চোর ধরতে এই সাপগুলো মহা ওস্তাদ। রাত্তিরবেলা যখন দোকান বন্ধ হয়, মালিক বাড়ী যাবার আগে সাপ দারোয়ানকে তার খাঁচা থেকে খুলে দোকানের ভেতরে ছেড়ে দিয়ে যান। চোরবাবাজী এখন দোকানে ঢুকলেই এই দারোয়ান খালি তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে মুখ দিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ করতে থাকে। আর যায় কোথায়? চোর বেচারা চুরি টুরি ভুলে গিয়ে ভয়ের চোটে এত দিশাহারা হয়ে পড়ে, যে তার আর আশেপাশের লোকেদের চিৎকার করে ডাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। পুলিশ এসে সাপটাকে সরিয়ে নিলে এই ঘটনায় সবচাইতে খুশী হয়, বোধ হয়—সেই চোরটি।

আদালতে

সোভিয়েত রাশিয়ার 'তিয়েন শান' পাহাড়ের জঙ্গলে এক ধরণের ছোট ছোট গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছের স্থানীয় নাম 'জ্বলন্ত ঝোপ'। এই গাছের পাতায় আছে ইথার—যা ডাক্তারবাবুরা আমাদের ইঞ্জেকশন দেবার আগে অনেক সময় ব্যবহার করেন। ইথার অত্যন্ত সহজেই জ্বলে ওঠে। এই গাছের পাতায় এতটা পরিমাণে ইথার আছে যে আবহাওয়া গরম এবং শুকনো থাকলে প্রায়ই গাছের ইথারে আগুন ধরে যায়। তারপর—বনে জ্বলে ওঠে দাবানল।

আমাদের এই ভারতবর্ষেও একবার বনে আগুন লাগবার পর অপরাধীকে খুঁজে বার করার জন্য অনেক চেষ্টা চরিত্র করা হয়েছিল। কিন্তু অপরাধী ধরা পড়েনি। শেষে বৈজ্ঞানিকরা অনুসন্ধান আর গবেষণা করে স্থির নিশ্চিত হ'ন যে বনে এই আগুন লাগিয়েছিল একটা ফুলের গাছ।

হ্যাঁ, সামান্য একটা ফুলের গাছই এই ভীষণ আগুন লাগানোর অপরাধে অপরাধী। এই ফুলের গাছের পাতায় পাতায় ও তার সারা শরীরে তেলের মত এত সহজদাহ্য জিনিষ আছে যে তারা একটু শুকনো আর গরম আবহাওয়া পেলেই—নিজে ত নিজের তেলে জ্বলে ওঠেই, আর সাথে সাথে পুড়িয়ে মারে বনের সমস্ত সঙ্গী সাথীদের।

পাখীর খাঁচা গাছ

সোভিয়েত রাশিয়ার 'আস্কানিয়া নোভা' অভয়ারণ্যে, একজনের মাথায় প্রথম এই আইডিয়া আসে। কাঠ বা বোর্ড দিয়ে পাখীর বাসা তৈরী না করে ফোঁপড়া কুমড়োর খোলা দিয়ে এটা তৈরী করলে কেমন হ'বে? যা ভাবা সেই কাজ। লম্বাটে লাউ বা কুমড়ো রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়ে ভেতরের ফালতু শাঁষটুকু ফেলে দিলেই—তৈরী হয়ে গেল একটা সুন্দর, টেঁকসই আর আরামদায়ক পাখীর বাসা। তখন বাকি রইল খালি পাখীদের আসা যাওয়ার জন্য কুমড়োর গায়ে একটা দরজা কেটে তৈরী করে দেওয়া। সে কাজ আর শক্ত কি?

কুমড়োর খোলা দিয়ে তৈরী পাখীর বাসা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে পাখীরাও এই বাসা খুব পছন্দ করে। এই রকম বাসা নানান গাছের ডালে ঝুলানোর পর তাতে শুধু মাছরাঙা বা চড়াই পাখীই নয় আরও বহুজাতের পাখী এসে বাসা বেঁধেছে। এমন কি বেশ কড়া মেজাজের দাঁড়কাকেরও এই বাসা অপছন্দ হয় নি। সেও এ রকম একটা বাসা নিয়ে নিয়েছে।

রাশিয়ার ঐ অভয়ারণ্যে গেলে তোমরাও দেখতে পাবে যে বহু গাছের ডাল থেকে প্রকৃতির তৈরী করা পাখীর বাসা ঝুলছে। আর সেই বাসার বাসিন্দাদের কি আনন্দ।

জল বিনা মছলি

আমাদের এই বাংলাদেশের কই মাছ ত সবারই চেনা। আর এর স্বভাব চরিত্রের কথাও আমরা অনেকেই জানি। খরার সময় নদী নালা শুকনো হয়ে এলেই এরা কানকোর ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাঙ্গায় উঠে আসে, মিষ্টি ও গভীর জলে ভর্ত্তি পুকুরে বা নদীতে যাবার জন্য। কই মাছকে ঘাসের ওপরে চলতে দেখা গিয়েছে এমনকি কখনও কখনও পুকুরের পাড়ের গাছের ওপরেও। তবে যদি আশে পাশে গভীর জলের উৎস একেবারে না থাকে, আর এদিকে খরার প্রকোপে নিজের পুকুরের জলও প্রায় শুকিয়ে এসেছে তখন মাছগুলো কাদার মধ্যেই মুখ গুজে পড়ে থাকে। এই মাছ ধরবার জন্য তখন বড়শির চাইতে কোদাল বা খোন্তারই বেশি প্রয়োজন—তাই না?

শুধু কই মাছই নয় যারা খরার সময় কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, আরও অনেক রকমের মাছ। যেমন ধর আফ্রিকার মাছ প্রটোপ্টেরাস। এরা খরার সময় ল্যাজ দিয়ে প্রথমে নিজের মাথাটাকে ঢাকে। তারপর সেই ল্যাজের উপর চাপায় কাদা আর বালির তৈরী এক পলেস্তরা। এই পলেস্তরা এমনি ভাবে তৈরী হয় যে তা মাছটার চারপাশে যেটুকু জল আছে তা গরমে উবে যেতে দেয় না। আবার যখন বৃষ্টি নামে, পুকুর ভরে ওঠে জলে তখন আর পলেস্তরার প্রয়োজনটা কি? বৃষ্টির জলে পলেস্তরা যায় ধুয়ে আর মাছও তখন চলে যায় তার আপন জায়গায়—পুকুরের গভীর জলের তলায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার 'লোক' মাছ ও ভেজা কাদা বা আধ শুকনো নদীর মাটি খুঁড়ে ধরা হয়।

সমজদার ধান

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রমান করেছেন যে শব্দ, বিশেষ করে গান বাজনার শব্দ, গাছপালার বেড়ে উঠবার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। নানা ধরনের শব্দ নিয়ে পরীক্ষা করে, তারা গাছের—বিশেষ করে ধান আর তামাক গাছের—বৃদ্ধি বাড়াতে বা কমাতে সক্ষম হয়েছেন।

তোমাদের বাড়ীতে রাখা কারনেশন ফুলের টবের সামনে লাউড স্পীকার রেখে কয়েকদিন ক্রমাগত হিন্দি ফিল্মি গান বাজাও, দেখবে কত তাড়াতাড়ি ফুলগুলো শুকিয়ে বিশ্রী হয়ে আসছে।

'গানের জোর' কথাটা কেবল কথার মারপ্যাচ নয়, এটা একেবারে সত্যিকারের জিনিষ। এই জোর কখনও জীবনদায়ী অবার কখনও প্রাণঘাতী পর্য্যন্ত হতে পারে।

পয়সার ওজন

তুমি যদি কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের 'ইয়াপ' দ্বীপে যাও তা' হ'লে দেখতে পাবে, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সামনেই পুরোন দিনের যাঁতার মত বিশাল বিশাল সব পাথরের চাকা পড়ে আছে। এগুলো অবিশ্যি এদেশের যাঁতাকলের পাথর নয় এগুলো এদের পয়সা বা 'খুচরো'। এই খুচরো পাথরের পয়সার এক একটার ব্যাস প্রায় আড়াই মিটারের কাছাকাছি আর ওজন—একটনের সামান্য এদিক সেদিক। তুমি বা আমি সে পয়সা তুলতেই পারব না। এমনকি এখানকার খুব পালোয়ানকেও এই পয়সা নড়াচড়া করাতে হলে বেশ লম্বা বাঁশের লাঠি দিয়ে কোন রকমে এগুলোকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিতে হয়।

তবে এই পাথরের পয়সা শুধু এ দেশের পুরুষদের ব্যবহারের জন্য। এ দেশের

মেয়েরা এই পাথরের পয়সা বাঁ হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখে না। তাদের নিজেদের জন্য সুন্দর সুন্দর বাঁশের মাদুর আর ঝিনুকের তৈরী টাকা পয়সা আছে, তাই বয়ে গেছে তাদের এই সব বেঢপ আর ওজনদার পয়সা ব্যবহার করতে।

১৭২৫ রুশদেশে, একবার বেশ ভারী ভারী তামার পাত, খুচরোর বদলে চালু করবার চেষ্টা হয়েছিল! যেমন ধর, এক রুবলের ওজন ছিল এক কেজি ছশ গ্রাম ওজনের একটা তামার টুকরো। সেই অনুপাতে তৈরী হয়েছিল অন্য সব পয়সা। অর্থাৎ একটা পঞ্চাশ কোপেক হল তোমার আটশ গ্রাম ওজনের, আর দশ কোপেকের ওজন—দেড়শ গ্রাম।
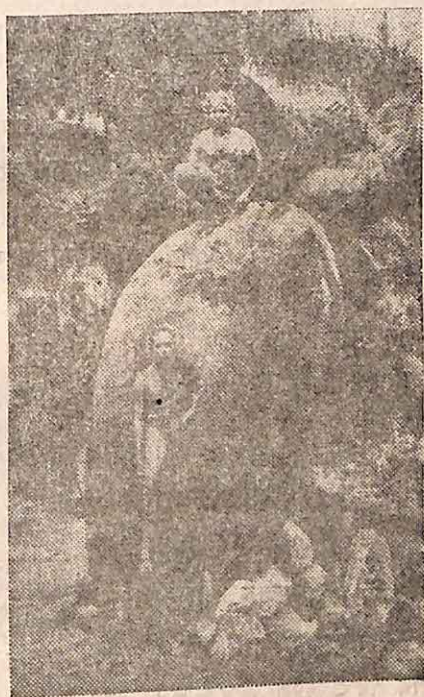
কিন্তু লোকেদের এমন ওজনদার পয়সা পছন্দ হল না। তারা সবাই নালিশ জানালো। যাঁরা এই তামার পাতের পক্ষে ছিলেন তাঁরাও লোকেদের এই অনুযোগ মেনে নিলেন। তাই দুবছরের মধ্যেই এই ভারী তামার পাতগুলো বদলে ছোট ছোট, গোল আর হাল্কা মুদ্রা চালাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু যখন নতুন পয়সা বাজারে এল, লোকে দেখল, এখন পাঁচ কোপেক মুদ্রার ওজন মাত্র দু'শ গ্রাম।

একটি শিকারের কাহিনী

মুরগীদের মত, হাঁসেরাও অনেক সময় ইচ্ছে করে খাবারের সাথে মোটা বালির দানা এমন কি কখনও কখনও ছোট ছোট পাথরের নুড়ি পর্যন্ত গিলে ফেলে। এই জিনিষগুলো হাঁসেরা হজম করতে পারে না ঠিকই, তবে এরা হাঁসেদের পেটের ভেতরের খাবার গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে তাদের হজম করতে সাহায্য করে। হাঁসের পেটে সীসের ছররাগুলি পাওয়া—কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। বহুবারই হাঁসেদের পেট থেকে এই গুলি বা ছররা পাওয়া গেছে। হাঁসেরা হয় এগুলো খাবার মনে করে ভুল করে, বা বালির দানার পরিবর্ত্তে ইচ্ছে করে গিলে ফেলেছে।

কুকুর রেণু

কুকুরের গন্ধ পাবার ক্ষমতা কি বাড়ানো যায়? বিজ্ঞানীদের মতে এটা সম্ভব। 'ফেনামিন' নামে এমন এক ধরনের উত্তেজক ওষুধ তাঁরা বার করেছেন, যে এই ওষুধের মাত্র দশ বা কুড়ি মিলিগ্রাম একটা কুকুরের শরীরে ঢুকিয়ে দিলে, তার ঘ্রাণশক্তি প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যেতে পারে। এই ওষুধ কুকুরের অধ্যাবসায়ও বাড়িয়ে দেয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে এই ওষুধের গুণে কুকুরগুলো তাদের শিকারের পেছন পেছন ছুটতে পারে, তাদের গড় সময়ের প্রায় তিনগুণ বেশী সময় ধরে।

একটু রং চড়ানো হলেও ব্রজদার গপ্পের মূল ঘটনাটি কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে।

সাঁতারু হাতী

বন্যা শুধু মানুষেরই নয়, জীবজন্তুদেরও অনেক দুঃখের কারণ।

১৯৫৯ সালে আফ্রিকার নদী 'জাম্বেজী'তে বন্যা হলে, তা এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। জাম্বেজী নদী ফুলে ফেঁপে উঠে দু'পাশের পাড় ত বটেই এমন কি আশেপাশের অনেকটা জমি পর্যন্ত গ্রাস করে নিল। খুব কম জায়গাই শুকনো রইল। যেখানেই একটু উঁচু মত শুকনো ডাঙ্গা পাওয়া গেল, সেখানেই শুয়ে শুয়ে আশ্রয় নিল বনের জীবজন্তুরা।

ওদেশের স্থানীয় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সমিতি এই অসহায় পশুদের বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আবেদন করল সবার কাছে। আর এই আবেদনে সাড়াও পাওয়া গেল সার্বজনীন। প্রচুর নৌকো যোগাড় করা হ'ল, আর কাঠের গুঁড়ি কেটে বানানো হল অসংখ্য ভেলা। তৈরী করা হল, ফলায় ঘুমের ওষুধের প্রলেপ লাগানো হাজারে হাজারে

তীর আর ঐ তীরের জন্য ধনুক। এই ঘুমপাড়ানি ওষুধ লাগানো তীর ছুঁড়ে ঘুম পাড়ানো হল যতগুলো সম্ভব ততগুলো সিংহ, চিতা, শিঙ্গেল, হরিণ বা মোষদের। ঘুমিয়ে

পড়ার পর এই সব জন্তুদের ভেলায় তুলে দূরে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে রেখে আসা হ'ল। কিন্তু মুস্কিল হ'ল হাতিদের আর গণ্ডারের সময়। তাদের ত আর এইভাবে বাঁচানো

যাবে না। কারণ এই জানোয়ার গুলোর গায়ের চামড়া এত শক্ত যে এতে তীর লাগানো

প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। তার ওপরে এদের এক একজনের যা ওজন, তাতে এদের বয়ে আনা বা নৌকোতে তোলাও সম্ভব নয়। কাজেই অনেক রকম চেষ্টা চরিত্রের পর প্রায় শেষ চেষ্টা হিসাবে এই জন্তুগুলোকে সোজা তাড়িয়ে নিয়ে আসা হ'ল জলের কাছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার—জলের কাছে এসে যেই না এদের পেছন থেকে একটু তাড়া দেওয়া—দেখা গেল তারা সুন্দর ভাবে জলে নেবে সাঁতার দিয়ে চলেছে। তখন আর কাজ বলতে বাকী রইল এই হাতী বা গণ্ডারের দলকে শুধু শুকনো পাড়ের দিকটা চিনিয়ে দেওয়া।

বৈষ্ণব নেকড়ে

চাষবাষ যাঁরা করেন, তাঁদের অনেকেই, বিশেষ করে শীতপ্রধান দেশের চাষীরা লক্ষ্য করেছেন, যে বহু সময় রাতের অন্ধকারে, নেকড়ের পাল তাদের তরমুজ ক্ষেতে ঢুকে সব পাকা তরমুজগুলো খেয়ে শেষ করে দেয়। শীতের সময় ক্ষিদের চোটে নেকড়ের দলকে শালগমের ক্ষেতেও ঢুকতে দেখা গিয়েছে—খুঁড়ে খুঁড়ে শালগম গাছগুলোর আগা-পাস্তালা খাচ্ছে। আর তার ওপরে যদি ক্ষেতের মালিক একটা বা দু'টো শালগম তুলতে ভুলে গিয়ে থাকেন—তা হলে ত একেবারে সোনায় সোহাগা। নেকড়েকে ঘাস খেতে কখনও না দেখা গেলেও খিদের মুখে তাদের নানা ধরনের ফল খেতে দেখা গিয়েছে।

চিড়িয়াখানার শিঙ্গেল হরিণ—যে সব চাইতে ঠাণ্ডা স্বভাবের—আর ঘাস পাতা ছাড়া বিশেষ কিছুই খায় না বলে যার বাজারে বেশ সুনাম আছে—তাকেও জীববিজ্ঞানীরা কখনও কখনও পাখী মেরে খেতে দেখেছেন।

কুমেরু অভিযাত্রীদের অভিজ্ঞতা আরও অবাক করা। তাঁরা দেখেছেন যে শীতের শেষে বল্গাহরিণ, প্রায়ই ওখানকার এক ধরনের ইঁদুর (Lemmings) ধরে ধরে খায়। ইঁদুর না পাওয়া গেলে, পাখীর বাসা তছনছ করে, পাখীর ডিম এমন কি পাখীর ছানা খেতেও এই বল্গাহরিণদের আপত্তি নেই।

জীববিজ্ঞানীদের মতে শুধু নিরামিষ খাওয়ার ফলে এই সব নিরামিশাষী পশুর খাবারে প্রায়ই অ্যালবুমিন আর খনিজ পদার্থের অতিরিক্ত অভাব ঘটে। এই ঘাটতি পূরণ করবার জন্যই তারা এই সব মুখ বদলানো খাবার খায়। আমিষ খাদ্য ওদের দেহে খনিজ পদার্থ দেয়, আর ডিম দেয় এ্যালবুমিন।

আবার বনে

খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু—অনেকটা মাশরুম বা ব্যাংএর ছাতার মত স্বাদ—অথচ মাটির তলায় পাওয়া যায়—এই রকম এক ধরনের কন্দের নাম হ'ল 'ট্রাফল'। এরা ছত্রাক শ্রেণীর উদ্ভিদ। মূলতঃ ফরাসী দেশের অধিবাসী। সারা পৃথিবীতে এর এত কদর যে ফ্রান্স

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে তার সারা বছরের ট্রাফল উৎপাদনের প্রায় শতকরা পঁয়তিরিশ ভাগ।

ঐতিহাসিকরাও সঠিকভাবে বলতে পারেন না যে ঠিক কবে থেকে মানুষ এই ট্রাফল এর গুণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে। তবে এ যে বহু প্রাচীনকাল ধরেই সবার—বিশেষ করে খাদ্যরসিকদের—অতি পরিচিত জিনিষ, তাতে কোন সন্দেহ-ই নেই।

ফ্রান্সে বিভিন্ন রকমের ট্রাফল হয়। সাইজে একটা কড়াইশুঁটির দানা থেকে, একটা কমলালেবুর মত—সবরকমই হ'তে পারে।

তবে ফরাসীদের মতে ট্রাফলের রাজা হচ্ছে 'পেরিগড'। এর চামড়াটা গাঢ় বাদামী বা কালচে মত আর ভেতরটা যত পাকা তত কালো। পাকা ট্রাফলের গন্ধটাও খুব সুন্দর।

মাটির প্রায় তিরিশ সেণ্টিমিটার নীচে লুকোন থাকে এই ট্রাফলের সম্পদ। এ সম্পদ খুঁজে বার করার জন্য তাই মানুষকে সাহায্য নিতে হয় পশুদের। শুয়োর দিয়েই প্রধানতঃ ট্রাফল খোঁজা হয়। তবে শুয়োর ছাড়াও এক ধরণের হলদে রংএর মাছি, বা বিশেষভাবে শিক্ষিত কুকুরও কখনও কখনও মাটির নীচের ট্রাফলের ভাঁড়ার খুঁজে বার করে দিতে পারে।

পৃথিবীতে ট্রাফলের এত চাহিদা হওয়া সত্ত্বেও খুব ভালো ভাবে এর চাষ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যে জায়গায় এরা সচরাচর জন্মায়, সেখানকার মাটির পেছনে প্রচুর খিদমত করলে, যদি তাদের মর্জি হয়, তা হ'লেই তারা সেখানে জন্মাবে। তাও পাঁচ বছর আশা নিরাশা নিয়ে অপেক্ষা করার পর। তবে তোমার যদি ট্রাফলের ব্যবসায় লাভ করবার ইচ্ছে থাকে, তা হলে তোমাকে অবিশ্যি আট থেকে দশ বছর অবধি অপেক্ষা করতে হবে—ভালো ফসল ঘরে তুলবার জন্য।

পেরিগর্ডের মত অত ভালো জাতের না হলেও ইংল্যাণ্ডে কিছু কিছু ট্রাফল পাওয়া যায়। আর আমেরিকায় এদের একেবারেই বসবাস নেই।

পৃথিবীতে যে কতরকমের পাখীর বাসা আছে, তা আর বলে শেষ করা যায় না। দুই সেণ্টিমিটার থেকে, বেশ কয়েক মিটার—সব রকম ব্যাসেরই বাসা পাখীরা তৈরী করে। তাদের এই বাসার ওজনও বাসার সাইজের মাপসই—কয়েক গ্রাম থেকে কয়েকশ টন—যা চাই, পাবে। পাখীরা তাদের হাতের কাছে যা কিছু পায় সবকিছুই লাগায় এই বাসা তৈরীর কাজে। কাঠকুটো, পাতা, শ্যাওলা, গাছের ছাল, পালক, ঘোড়ার চুল এমন কি সাপের চামড়া পর্যন্ত—সবকিছুই তুমি পাবে এদের বাসায়। কোন বাসা পাথরের নুড়ি দিয়ে সাজানো আবার কোনটা শুধু ধুলো আর কাদা দিয়ে তৈরী।

সেলাই করা, ঠোঁট দিয়ে বোনা বা ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া করে কাদার পুলটিস লাগানো—সব রকম শিল্পকর্মের নমুনা দেখতে পাওয়া যায় এই বাসা তৈরীর পেছনে।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার পাহাড়ের কাছাকাছি প্রায় বারো রকমের পাখী দেখতে পাওয়া যায়—যাদের সমষ্টিগত নাম প্রাণীবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন—'মেগাপোড' শ্রেণীর পাখী। এরা অন্যান্য পাখীদের থেকে একটু আলাদা। ডিমে তা' দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর জন্যই পাখীরা সাধারণতঃ তাদের বাসা তৈরী করে। আর এই মেগাপোডদের ডিমে তা' দেবার সময় বা ইচ্ছে, কোনটাই নেই। যে সব জিনিষপত্র দিয়ে সচরাচর এরা তাদের বাসা বানায় সেগুলো পচে উঠবার সময় যে তাপ বিকিরণ করে তাই এদের ডিম ফোটাবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য বেশী উত্তাপ পাবার জন্য এরা অনেক সময় আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি বাড়ী তৈরী করে। মাটির নীচে আগুনের তাপই ডিমে তা দেবার কাজটা করে দেয়।

এই মেগাপোড পাখীদের বাড়ির একটা গড়পড়তা সাইজ হচ্ছে—এক মিটার উঁচু আর পাশে সাড়ে চার মিটার। মেঝেটা খড়কুটো আর লতাপাতা দিয়ে ঢাকা। এই মেঝে তৈরী হলে পর প্রথমে তা বৃষ্টির জলে বেশ ভালো করে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেই ভেজা মেঝের ওপর বাবা পাখী ছড়িয়ে দেয় প্রায় আধমিটার পুরু মাটির স্তর। এই মাটির স্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে বাসার তাপ ঠিক রাখা। তা এ কাজটা খুব ভালো ভাবেই হয়। যখনই দেখ না কেন, এই মেগাপোড পাখীর বাসার তাপ সর্বদাই থাকে প্রায় কাঁটায় কাঁটায় তেত্রিশ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। বাবা পাখী রোজ তার ঠোঁটের থার্মোমিটার দিয়ে ঘরের তাপমান মেপে নেয়। তারপর বেশী বা কম কিছু একটা হলেই
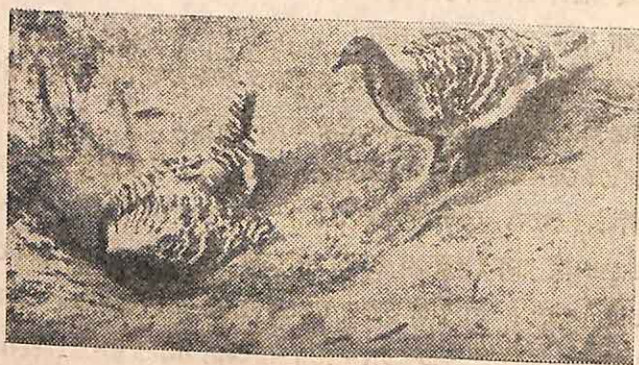
সেটাকে ঠিক করে মেঝের ঐ মাটির আস্তরণটা পুরু বা পাতলা করে। গুহার ভেতরের সঠিক উত্তাপে বাচ্চারা আপনি ডিম ফুটে বার হয় আর জন্মেই এরা সাবালক।

এই বাসা তৈরী করতে একটা বাবা পাখীর প্রায় এগার মাস সময় লাগতে পারে।

কখনও কখনও অনেকগুলো বাবা পাখী একসাথে হয়ে একটা বাসা তৈরী করে। অনেকটা আমাদের সমবায় পদ্ধতির মত—তাই না? আর এই সমবায়িক বাড়ীতে একদল মা পাখী দল বেঁধে একসাথে ডিম পাড়ে, আমাদের শিশুসদনগুলোতে যেমন হয় আর কি। এ'রকম এক একটা পাখীর বাসায় একসাথে পঞ্চাশ বা ষাটটা ডিম দেখা গিয়েছে।

অনেক সময় সবাই মিলে তৈরী করা পাখীদের এই সব বাড়ী সাড়ে ছ মিটার অবধি উঁচু হতে দেখা গিয়েছে। আর এই বাড়ীর ওজন? প্রায় দুশ টনের কাছাকাছি। কুড়িটা বড় বড় লরির বোঝা।

বিশ্বাস করতে একটু অসুবিধা হলেও কথাটা একদম সত্যি যে নুন শুধু সমুদ্রের জলেই নেই। বৃষ্টির জল এমন কি পাহাড়ে জমা বরফও নোনতা হ'তে পারে। কখনও কখনও মেঘ বা কুয়াশার স্বাদও নোনা লাগতে পারে। ঐ যে সুকুমার রায়ের 'কাঠবুড়ো' বলেছিল না—তবে টক্ টক্ নয়, নোনতা।

কুমীরের চোখের জলও বেশ নোনতা। শরীরে যখন বেশ খানিকটা নুন জমে যায় তখন সেটা বার করে দেবার অন্যতম উপায় হচ্ছে কুমীরদের এই চোখের জল। চোখের জলের সাথে গলে মিশে থাকা নুন বেরিয়ে যায়। আমাদেরও যেমন গরমকালে ঘামের সাথে শরীরের ভেতরের জমা নুন বেরিয়ে যায়—ঠিক তেমনি। 'কুম্ভীরাশ্রু' কথাটার মানে অন্য যা কিছুই হোক না কেন এটাকে কুমীরের ঘাম বললে কারুর আপত্তি করার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।

টেনিদার গল্প

জাহাজীরা নানান আষাঢ়ে গল্পের আড়ৎদার বলে একটা দুর্নাম আছে ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের অভিজ্ঞতা সত্যিই আশ্চর্যজনক হয়ে পড়ে।

সোভিয়েত রাশিয়ার জাহাজ 'কুবাণ' একবার প্রশান্ত মহাসাগরের ঝড়ের মধ্যে পড়ে। আলেকজাণ্ডার নামে এক খালাসী কি কাজে তখন ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একটা ঢেউ এসে আলেকজাণ্ডারকে এমন জোরে ধাক্কা মারে যে সে উল্টে একদম জলের মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু ভাগ্য ভালো বলতে হবে, তক্ষুণি পরের ঢেউটাই আবার ওকে জল থেকে তুলে নিয়ে ডেকের ওপর ছুঁড়ে দেয়—জলে পড়ার আগে ঠিক যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক সেইখানে।

১৯২৭ সালে দক্ষিণ মেরুর সমুদ্রে প্রায় একশ আশি কিলোমিটার লম্বা জলে ভাসা এক বরফের পাহাড় (হিমশৈল) দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

তবে ইনি পৃথিবীর সবচাইতে বড় হিমশৈল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে যাঁকে দেখা গিয়েছিল। তাঁর চেহারাটা বলি শোন। সাড়ে তেরশ কিলোমিটার লম্বা, এগারশ কিলোমিটার চওড়া আর আঠাশ মিটার উঁচু। তবে ইনি হিমশৈলদের মধ্যে খুব লম্বা নন—বেশ বেঁটেই। আমাদের জানা সবচাইতে উঁচু হিম-

শৈলের উচ্চতা প্রায় একশ ষাট মিটার। ১৯৫০ সালে এঁর একটা ছবিও নেওয়া হয়েছে—হেলিকপ্টারে চড়ে।
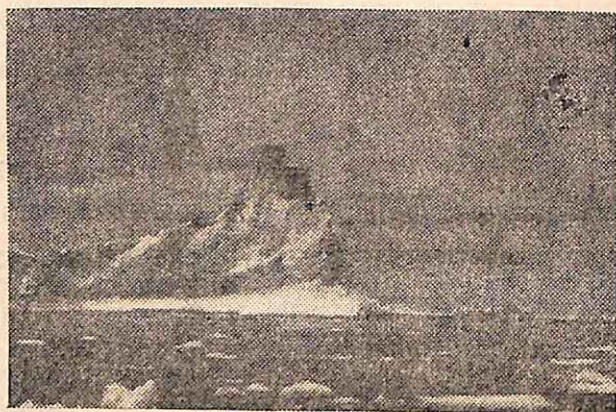
উত্তর মেরুর চাইতে দক্ষিণ মেরুর হিমশৈলগুলি সচরাচর সাইজে বড় হয়। দক্ষিণ মেরুর অধিবাসী, আমাদের জানা সবচাইতে বড় হিমশৈল হচ্ছে তিনশ তেত্রিশ কিলো-মিটার লম্বা আর একশ কিলোমিটার চওড়া। ১৯৫৬ সালে এক আমেরিকান জাহাজের সাথে এঁর প্রথম মোলাকাত আর সেই জাহাজ এঁর চেহারার মাপ নিয়ে সবাইকে জানায়।

তবে চেহারায় যত বড়ই হোক না কেন, অধিকাংশ সময়েই একটা হিমশৈল দশ বছরের মধ্যে সমুদ্রের জলে গলে মিশে যায়।

দক্ষিণ মেরুর হিমশৈলরা তাদের উত্তর মেরুর জাতভাইদের চাইতে একটু বেশী চলা-ফেরা করতে পছন্দ করে। এদের অধিকাংশকেই ষাট ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশের ওপরে দেখতে পাওয়া যায় না—তবে মাঝে মাঝে, কেউ কেউ বেয়াল্লিশ ডিগ্রী অবধি ওপরে বেড়াতে আসে। ১৮৫০ সালে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণে এদের একজনকে দেখা গিয়েছিল। তবে এরা সীতার গণ্ডির মত সাড়ে ছাব্বিশ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশের গণ্ডী মেনে চলে। কখনও এ গণ্ডী পার হয় না।

মাছেরাও কখনও কখনও জাহাজ আক্রমণ করে বসে।

১৯৪৫ সালে 'বারবারা' নামে একটা তেলের ট্যাঙ্কারকে, এক তরোয়াল মাছ (Sword fish) আক্রমণ করে আর জাহাজের খোলে লাগানো লোহার পাত ফুটো করে দেয়। জাহাজের খালাসীরা তাড়াতাড়ি খোলের ফুটোটা বন্ধ করে দিয়ে অনেক চেষ্টা চরিত্র করার পর মাছটাকে ল্যাজে ফাঁস পরিয়ে জাহাজে টেনে তোলে। মাছটা লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ মিটার আর ওজন —মাত্র সাতশ কেজি। এই বপু নিয়েও জলের ভেতরে ইনি ঘণ্টায় প্রায় সত্তর কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারেন।
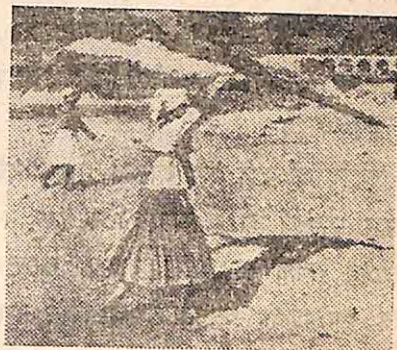
১৯৪৪ সালে আফ্রিকার উপকূলে এইরকম এক তরোয়াল মাছ তার নাকের তরোয়াল চালিয়ে একটা মাছ ধরার নৌকো ফুটো করে ডুবিয়ে দেয়। নৌকোর লোকেরা অশেষ দুর্গতি ভোগ করে শেষে সাঁতরে পাড়ে ওঠে।

বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'লিওপোল্ড'কেও একবার এমনিধারা রাগী এক তরোয়াল মাছের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মাছটা জাহাজের তলা বেশ কয়েক জায়গায় ফুটো করে দেয়। শেষে যুদ্ধ জাহাজকেই নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য জাহাজ থামিয়ে, ডুবুরী আর মিস্ত্রি নামিয়ে সেই ফুটো মেরামত করতে হয়—তবে রক্ষে।

মাৎস্যন্যায়

'তাই য়ু' বলে একজাতের মাছ, প্রতি বছর শীতের শুরুতে ডিম পাড়বার জন্য, দল বেঁধে দক্ষিণ চীন সাগরের কূলের নদীগুলোর মোহানার কাছে চলে আসে। এ অঞ্চলের মাছ শিকারীদের মতে এই তাই য়ু মাছ ধরার সবচাইতে ভালো চার বা টোপ হচ্ছে এই মাছের ল্যাজ। তুমি যদি কোনরকমে একটা মাছ তোমার বঁড়শিতে গাঁথতে পারো তা' হলেই কেল্লা ফতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় মাছটা এসে প্রথমটার ল্যাজ কামড়ে ধরবে। তারপর তৃতীয় জন কামড়াবে দ্বিতীয়ের লেজ। এইভাবে একটার ল্যাজ কামড়ে আর একটা। ভাগ্য ভালো থাকলে একবার বঁড়শি ফেললেই—একসাথে ছটা মাছ লাভ। এ ছাড়া আরো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ল্যাজ কামড়ানো মাছই তার আগের মাছটার চাইতে সাইজেও একটু বড়।

আমাদের বোঝার মত ভাষায় না হলেও, মাছেরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথা বলে—

একে অপরের কথা শুনতেও পায়। কাজেই বুঝতেই পারছ, মাছেরা বোবা বা কালা কোনটাই নয়। অনেক সময় মাছশিকারীরা মাছেদের এই কথাবার্তার শব্দ শুনেই জানতে পারেন যে ঠিক কোথায়, কতগুলো আর কি ধরণের মাছ আছে। মালয়েশীয় জেলেরা প্রায়ই জলের ভেতর কান ডুবিয়ে মাছেদের কথা শোনে। তারপর তোমাকে তারা ঠিক ঠিক বলে দেবে যে জলের নীচে কি জাতের মাছ আছে, তাদের সংখ্যাই বা কত আর এখন তারা কি করছে ?

'জুফিলি' বলে এক জাতের মাছ আছে যারা খাবার সময়, গরম চাটুর ওপর ভাত ছড়ালে যেরকম আওয়াজ হয় ঠিক তেমনি চটপট করে আওয়াজ করে। 'গুরামি' ত আমাদের সবার চেনাজানা মাছ। অনেকেরই বাড়ীর অ্যাকুরিয়ামে রাখা হয় একে। এদের কথাবার্তার আওয়াজ, অনেকটা কাঠের চামচ ঠুকলে যেমন শব্দ হয়—তেমনি। 'ড্রাম' মাছ একে অপরের সাথে যে ভাষায় কথা বলে, সেটা আমাদের কানে শোনায় 'টাক্ টাক্' শব্দের মত। কেউ কেউ বলেন হেরিং মাছ চড়াই পাখীর মত শব্দ করে কথা বলে আর 'স্প্রাট' মাছের গলার আওয়াজ গম্ভীর কিন্তু একটানা। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে মানুষের মত মাছেদের ভাষাও অনেক ধরণের। মাছেদেরও ত ঘরকন্না, সমাজ-আচার, লোক-লৌকিকতা আছে। কথা না বললে তাদেরই বা চলবে কি করে ?

আধুনিক সিন্ধবাদ

১৯৫৮ সালে কানাডা থেকে প্রকাশিত একটা মাসিক পত্রিকা 'তিমির ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতির বিবরণ' আর 'তিমি ধরার বিপদের' ওপর কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধগুলোর উৎস ছিলো অবশ্য বহু পুরোন আর এতদিন ধরে প্রায় অজানা একটা বইয়ের অংশবিশেষ। এই লেখাগুলির সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটুকু হচ্ছে ১৮৯১ সালে এক তিমি শিকারী দলের অভিজ্ঞতার কাহিনী।

এই তিমি ধরার দল যে জাহাজে ছিল সেটা, একদিন একটা তিমি দেখতে পেয়ে শিকার করা ঠিক করে। জাহাজ থামানো হল। আটজন খালাসী আর প্রধান তিমি শিকারী নৌকো চেপে চলল শিকারের উদ্দেশে। মাছটার কাছাকাছি গিয়ে ভালো করে তাক্ করে ছোড়া হল দুটো হারপুণ। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, দুটো হারপুণই গিয়ে সোজা বিঁধল মাছের গায়ে। তারপরই ঘটল যত বিপত্তি।

তিমিটার কতটা ব্যথা লেগেছিল জানা নেই তবে পুচকে মানুষদের এই রকম ব্যবহারের জন্য সে মোটেই তৈরী ছিল না। সে গেল ক্ষেপে। আর সোজা এসে আক্রমণ করল নৌকোটাকে। ল্যাজের এক ঝাপটায় দিলো নৌকোটাকে উল্টে।

নৌকোটাকে উল্টে যেতে দেখেই জাহাজের অন্যান্য লোকেরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জলে পড়া মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে শুরু করে। নৌকোর ছ'জন আরোহী প্রচুর হাবুডুবু খেয়ে জাহাজে ফিরে এল। একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হল জল থেকে। কিন্তু আট নম্বর লোকটি—জেমস বার্টলী যার নাম—তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

যাই হোক, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, সবাই মিলে চেষ্টা করে, তিমি মাছটাকে ত মেরে ফেলল। তারপর ওটাকে তোলা হল জাহাজে। তেল, চর্বি, মাংস সবকিছু আলাদা করার জন্য যেই না মাছটাকে কাটাকুটি করা শুরু হয়েছে—হঠাৎ একজন খালাসী লক্ষ্য করল যে মাছটার পেটের মধ্যে কি যেন নড়াচড়া করছে। সাথে সাথে যেই পেটটা কাটা, অমনি দেখা গেল যে তিমি মাছের পেটের ভেতর তাদের হারিয়ে যাওয়া সাথী জেমস বার্টলী শুয়ে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছে কিন্তু প্রাণে বেচে আছে।

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সমুদ্রের উপকূলের হাঁসপাতালে জেমস বার্টলীকে নিয়ে চলল যমে-ডাক্তারে লড়াই। শেষে জয় হ'ল মানুষেরই। ভালো হয়ে উঠে বার্টলী নিজের কাহিনী বলল সবাইকে। যখন তিমি মাছটা নৌকোটাকে দিয়েছিল উল্টে, অন্য সবার মত একবারে জলে না পড়ে বার্টলী, ল্যাজের ঝাপটায় খানিকটা ওপরের দিকে ছিটকে গিয়েছিল। আর নেমে আসবার সময় জলে না পড়ে ও সোজা গিয়ে পড়ে তিমির খোলা মুখের ভেতরে। আর এই মুখে পড়বার কিছুক্ষণ পরেই ও তিমির পেটের ভেতর পা হড়কে চলে যায় এবং সেখানে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

বার্টলীর ভাঙ্গা শরীর অবশ্য কখনই খুব একটা জোড়া লাগে নি। ওর মুখ, ঘাড় আর হাত ভর্তি হয়ে গিয়েছিল সব শাদা শাদা দাগে। কারণ তার শরীরের ঐ সব জায়গায়, তিমির পেটের জারক রস, বার্টলীকে হজম করা শুরু করে দিয়েছিল।

এ সব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বার্টলী আবার জাহাজেই চাকরী নেয়। তবে এবার সাধারণ যাত্রীবাহী জাহাজ। এই ঘটনার পর সে বেঁচেছিল আরও পাঁচ বছর। ১৮৯৬ সালে বার্টলী মারা যায়।

যে তিমি বার্টলীকে পেটে পুরেছিল সে ও তার জাত ভাইদের গলা সচরাচর হয় বিশাল চওড়া। এদের পেটের ভেতরে প্রায়ই দুই বা আড়াই মিটার লম্বা, আস্তো আস্তো হাঙ্গর দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য, তিমির প্রধান খাদ্য হচ্ছে অক্টোপাস অথবা 'কালামারি' বলে এক ধরনের সামুদ্রিক মাছ। এর কারণটা খুব সহজ। জলের আটশ বা হাজার মিটার নীচে, যেখানে তিমির হামেশাই আনাগোনা সেখানে এ ছাড়া বিশেষ আর অন্য কোন মাছ পাওয়া যায় না।

তিমির খাদ্য, এই গভীর জলের জন্তুগুলোর শরীরের অংশবিশেষ থেকে—যা তিমির

পেটের ভেতর সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে—এক রকমের উজ্বল নীল আলো বার হয়। 'কালামারি' মাছের আঁশ, চোখ আর লম্বা ঠোঁট থেকেই মূলতঃ এই আলো
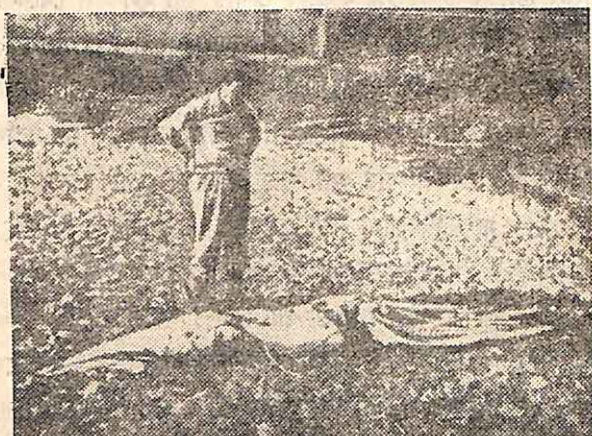
বার হয়। আর মাছের হাড়ে যে বেশ ভালো রকমের ফসফরাস আছে—এত আমরা সবাই জানি।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন তিমির পেটের ভেতরের আলোর উৎস হচ্ছে মাছেদের শরীরের এই সব অংশ—যা তিমির জারক রসে জীর্ণ হয়েও আলো দিয়ে চলেছে।

ঢেউ এর পর ঢেউ

আমরা সাধারণভাবে, কোন জিনিষের উপমা দিতে হলে বলি যে 'সমুদ্রের ঢেউ এর মতই বিশাল'। তবে একথাও আমাদের অজানা নয় যে ঝড়ের সময়ে সমুদ্রে যে ঢেউ দেখা যায় তার কাছে শান্ত সমুদ্রের ঢেউএর বিশালতার কোন তুলনাই হতে পারে না।

সমুদ্রে সবচাইতে বড় ঢেউএর সৃষ্টির কারণ অবশ্য ঝড় নয়—সমুদ্রের তলায় ভুমিকম্প বা জলের নীচের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। এই ঢেউগুলোর কাছে ঝড়ো সমুদ্রের ঢেউএরা নিতান্তই ছেলেমানুষ। সমুদ্রের তলার জমির পরিবর্ত্তনের ফলে এই ঢেউগুলির জন্ম, আর এদের নাম তাই—'ৎসুনামি'।

এই ৎসুনামিদের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিটাশ উঁচু হয় আর এদের গতি ঘণ্টায় সাড়ে ছ'শ কিলোমিটারেরও বেশী হতে পারে। তবে গতি আর উচ্চতা সমান তালে চলে না। যে ঢেউএর যত কম গতি সে ততই উঁচু হতে থাকে।

এখন এই ৎসুনামিদের যাবার পথে যদি কোন জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকে বা আশেপাশের

গাড় যদি খানিকটা খাড়াই ধরণের হয়, তাহ'লে ত সোনায় সোহাগা। এই ঢেউগুলির মধ্যে আটকে পড়ে থাকে প্রচুর বাতাস। যখন সেই জলের পর্বত কোন শক্ত বাধায় ধাক্কা খায়, তখন ভেতরের সেই আটক থাকা বাতাস জলের চাপে ক্রমশঃ সংকুচিত হতে থাকে। প্রচণ্ড চাপে সংকুচিত করা এই বাতাস যখন মুক্তি পায় জলের এই কারাগার থেকে, তখন হাতের কাছে যা পায় তাকেই টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। একটা জাহাজ ভেঙ্গে
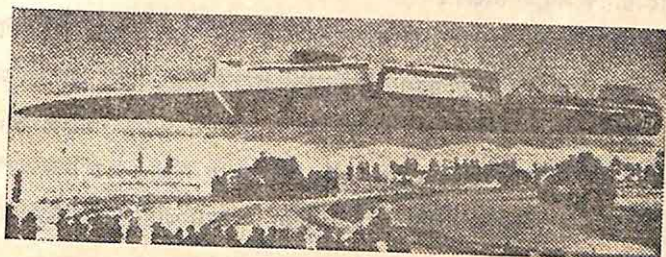
দু'টুকরো করা বা, আস্তো একটা জাহাজকে পাড়ে ছুঁড়ে দেওয়া, এদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়।

১৮৯৬ সালে পর পর সাতটা ৎসুনামি এসে আছড়ে পড়েছিল একটা ছোট দ্বীপের ওপর। তার ফল হ'ল সাতাশ হাজার লোকের মৃত্যু আর সাথে পাঁচ হাজার জন আহত। জলের এক নাম জীবন হলেও কখনও কখনও জল মৃত্যুর দূত হিসাবেও আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

সবুজ রক্ত

বিখ্যাত ডুবুরী ক্যাপ্টেন কস্তো একদিন সমুদ্রে, জলের অনেক গভীরে একটা হাঙ্গরকে হারপুণ দিয়ে গেঁথে ফেলেন। হাঙ্গরটাকে মেরে ক্যাপ্টেনের যত না আনন্দ, তার থেকে অনেক বেশী অবাক হলেন তিনি। কারণ হারপুণ বেঁধা হাঙ্গরটার গা থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসছে, আর এ রক্তের রং সবুজ।

জলের গভীরে, লাল, কমলা বা হলদে, অর্থাৎ সব ক'টা উজ্বল রংই তাদের নিজেদের স্বাভাবিক উজ্বলতা হারিয়ে ফেলে। তার বদলে এদের সবাইকেই কেমন যেন একটা ম্যাটমেটে সবুজ রংএর দেখায়। এমন কি জলের অনেক নীচে রক্তও আর লাল বলে মনে হয় না। রক্তকে দেখায় একেবারে সবুজ রংএর।

কিন্তু এত গেল চোখের ধাঁধাঁ বা চোখের ভুলের কথা। কিছু ধরণের প্রাণী আছে যাদের রক্তের রং কিন্তু সত্যিই সবুজ।

সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তেই আছে হেমোগ্লোবিন, আর লোহা সেই হেমোগ্লোবিনের

অন্যতম মূল উপাদান। কাজেই যে প্রাণীর রক্তে হেমোগ্লোবিন আছে—তাদের রক্তের রং লাল ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে না। কিন্তু বহু জাতের অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক পোকা আছে—যাদের রক্তে একফোঁটাও হেমোগ্লোবিন নেই কিন্তু আছে 'ক্লোরোকুয়োরিণ' নামে লোহা আর অক্সিজেনের এক ধরণের যৌগ। মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তে হেমোগ্লোবিনের যা কাজ, এই ক্লোরোক্রুয়েরিনেরও ঠিক সেই কাজ। কেবল এর রং লাল নয়—সবুজ। তাই এই পোকার রক্ত সবুজ রংএর।

কয়েক ধরণের কাঁকড়া বিছে আর মাকড়সা আর অক্টোপাস ধরনের কয়েকটা মাছের রক্ত আবার সবুজ নয়—নীল রংএর। এর কারণ এদের রক্তে আছে আবার আর এক ধরণের যৌগ যার নাম 'হেমোসায়ানিন'। এখন হেমোসায়ানিনে আছে তামা অথচ এর কাজ হেমোগ্লোবিনের মতই। তামা থাকার জন্য এই যৌগের রং নীল। জীবজগতের শ্রেণী-বিভাগে খুব একটা উঁচু স্তরের অধিবাসী না হলে কি হবে খাঁটি 'নীল রক্ত' পৃথিবীতে একমাত্র এই সব প্রাণীদেহেতেই কেবল আছে।

লোকেরা যে বলে রক্তের রং লাল—কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। কারুর রক্ত সবুজ রংএর কারুর বা নীল।

দাদাকথামৃত

মেক্সিকোর উপসাগরের কূলে, ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে, হঠাৎ দেখা দিল লাল রংএর এক ধরনের জোয়ারের জল। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, যে সব জীবজন্তু এই লাল জল ছুঁয়ে দেখল, প্রায় সাথে সাথেই তাদের ঘটল মৃত্যু। মৃত্যুর এই দূত, লাল রংএর ঢেউএর ছদ্মবেশে পাড়ে ছুঁড়ে দিল হাজার হাজার মরা মাছ, মরা কাঁকড়া আর মরা গুগলি। উপসাগরের প্রায় চারশ কিলোমিটার ধরে চলল তাদের এই নৃশংস হত্যালীলা, আর এই ঘটনা স্থায়ী হল তেরদিন ধরে অবিশ্রাম।

বন্দরগুলোর সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেল। মরা মাছের গন্ধে আর তাদের থেকে বেরোন ভাপে, লোকেদের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। চোখ আর গলার অসুখও বেড়ে গেল অস্বাভাবিক ভাবে।

খবর নিয়ে জানা গেল যে শুধু মেক্সিকোই নয়, পেরু, ক্যালিফোর্ণিয়া, আফ্রিকা আর জাপানের উপকূলেও যে এই মৃত্যুদূত মাঝে মাঝে আনাগোনা করেছে—তার ইতিহাস রয়েছে।

যদিও এই লাল জলের উৎপত্তির সঠিক কারণ এখনও অজানা, তবু কিছু কিছু বিজ্ঞানীর মতে জোয়ারের জলের এই রকম লাল রংএর কারণ হচ্ছে, জলে জন্মানো লক্ষ

লক্ষ, কোটি কোটি লাল রংএর পোকা। এই পোকাগুলি অবশ্য এত ছোট, যে অনু-বীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে এদের দেখা সম্ভব নয়।

সাধারণ সময়েও এই পোকা সমুদ্রের জলে থাকে। তবে তখন তারা সংখ্যায় কম। অর্থাৎ সোয়া লিটার সমুদ্রের জলের এদে সংখ্যা হাজার জনের বেশী নয়। লাল জোয়ারের সময় এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ছ কোটি।

জলের 'পেলে'

জলের জীবেদের মধ্যে সবচাইতে বেশী বুদ্ধিমান প্রাণী হল ডলফিন বা শুশুক।

আমেরিকার চিড়িয়াখানায় প্রকাণ্ড এ্যাকুরিয়ামের ভেতর এই শুশুকদের পোষা হয়। এই শুশুক গুলো কখনও কখনও বাস্কেট বল খেলে। এরা এই খেলাতে এখন এত দক্ষ হয়ে উঠেছে যে বল ধরতে না পারা বা বল মিস করা, অথবা ঠোটের ধাক্কায় গোল দিতে না পারা—এসব এখন এক বিরল ঘটনা। পাড়ে বসে থাকা সীল মাছ
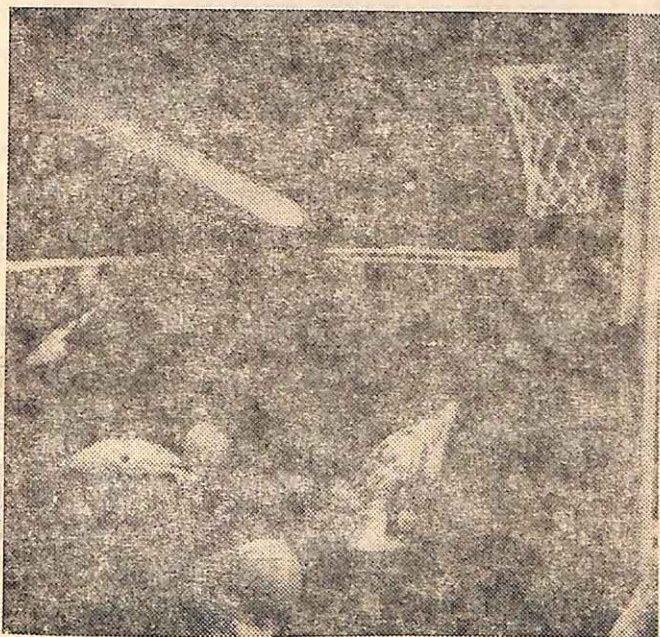
দর্শকেরা (এরাও ঐ চিড়িয়াখানার বাসিন্দা) তাদের সামনের পাখার চাপড়ে হাততালি (!) দিয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেয়। আর ঠিক মানুষ দর্শকদের মতই খুব বেশী চেঁচামেচি করতে থাকে। এই খেলা দেখতে মানুষেরা উপস্থিত থাকতে পারে, তবে

তাদের উপস্থিতি গৌণ। এখানকার মুখ্য আকর্ষণ হচ্ছে এই শুশুকেরা ও তাদের দলের ভক্ত ঐ সীল মাছের দল।

শিখিয়ে নিলে শুশুকদের দিয়ে অনেক রকম খেলা দেখানো যায়। এরা রিং এর মধ্য দিয়ে লাফাতে পারে এমন কি চিড়িয়াখানার রক্ষকের মুখ বা হাত থেকে খাবার নেবার জন্য তারা জলের ভেতর সোজা লাফিয়ে উঠতে পারে। আর তুমি যদি খুব পীড়াপীড়ি কর তা হলে দুজন শুশুক একত্র হয়ে তোমাকে একটা দ্বৈত সঙ্গীতও শুনিয়ে দিতে পারে। তবে ভাষাটা ওদের নিজেদের। অন্য ভাষায় গান গাওয়া বা কথা বলা, ওরা বিশেষ পছন্দ করে না।

সাগর তলে

ঝিনুকেরা অসংখ্য জাতের, অসংখ্য রকমের হ'তে পারে।

পৃথিবীতে বারো হাজারেরও বেশী জাতের ঝিনুক দেখতে পাওয়া যায়। এই বারো হাজারের মধ্যে কেবল পাঁচশ রকমের ঝিনুক মিষ্টি জলের অধিবাসী।

এই বিশাল ঝিনুক গোষ্ঠির এক এক জনের চেহারাও এক এক রকমের। কারুর দেহের ব্যাস এক মিলিমিটার আবার কেউ দেড় মিটার ব্যাসের। তবে বিশাল বিশাল ঝিনুকের যে সব গল্প প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় তার অধিকাংশই আষাঢ়ে।

সমুদ্রের প্রায় সব গভীরতাতেই ঝিনুকের দেখা পাওয়া যায়। জলের ছ'শ মিলিমিটার থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরে চার হাজার আটশ মিটার নীচেও এদের দেখতে পাওয়া গিয়েছে। একটা বড় ঝিনুকের ওজন তিনশ কিলোগ্রাম অবধি হতে পারে।

জলের নীচে কাদা, বালি আর সামুদ্রিক গাছপালার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে লুকিয়ে রেখে, ঝিনুকগুলো তাদের দুটো খোলা দিয়ে তৈরী দরজা খুলে রাখে শিকারের জন্যে। কোন শিকার বা কোন মানুষ ডুবুরীও যদি ভুল করে ঐ দরজার মাঝখানে হাত অথবা পা দিয়েছে—অমনি দরজা বন্ধ। তখন আর শিকারের পালাবার কোন উপায় নেই।

বিখ্যাত ডুবুরী হানস হাস একবার একটা নকল পা সাথে নিয়ে জলের নীচে নেমেছিলেন। নীচে নেমে একটা ভালো সাইজের ঝিনুক দেখে, হাস যেই না তার নকল পাটা দিয়ে মেরেছেন ঝিনুকটাকে এক খোঁচা, অমনি লোহার তৈরী যাঁতাকলের মত ঝিনুকের খোলা দুটো ঐ পাটাকে কামড়ে ধরেছে। আর সেই কামড়ের কি জোর, হাস আধঘণ্টা ধরে অনেক ধস্তাধস্তি করেও পাটাকে সেই ঝিনুকের মুখ থেকে ছাড়াতে প্যারেন নি।

লোহিত সমুদ্রে গেলে তুমি 'সমুদ্রের শয়তানের' (Devil hay বা Devil fish) কাজকর্ম দেখতে পাবে। চ্যাপটা মত দেখতে, লম্বার চাইতে বেশী চওড়া কালো বা বাদামী রং-এর হাঙ্গর জাতের এই মাছের, বুকের দু'পাশে দুটো বিশাল ডানা আছে। এ' ডানা দুটো এত বড় দেখতে যে এদের শয়তানের ডানা বললেও অন্যায়
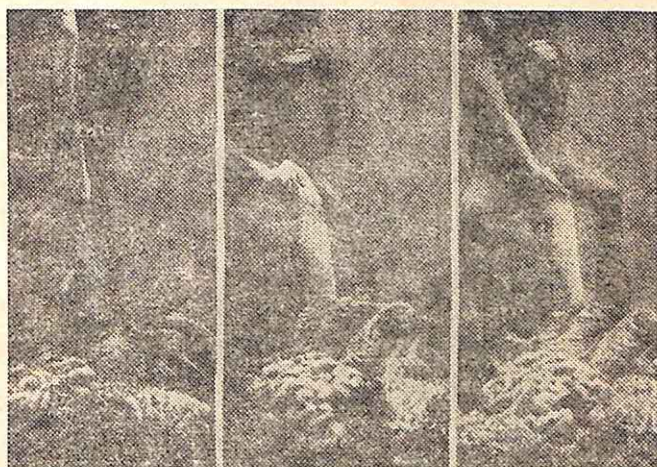
হবে না। এই ডানা দুটো যেখানে শেষ হয়েছে—অর্থাৎ মাছটার মাথার নীচে, ঠিক তার ওপরেই বেরিয়েছে দুটো শুঁড়। শয়তানের মাথার শিং আর কি। চওড়ায় এরা
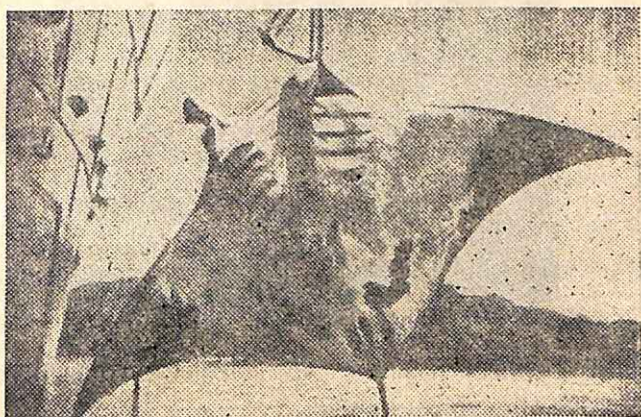
কেউ কেউ সাত মিটার অবধি হতে পারে। আর ওজনটাও হাল্কাই বলতে হবে বই কি, মাত্র একটনের কাছাকাছি।

কিন্তু এই চেহারা বা এই ওজন হ'লে কি হবে, এই মাছগুলো জলের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে জলের ওপরে প্রায় তিন মিটার অবধি উঠে আসতে পারে।

প্রাণী বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সমুদ্রে দু'শ জাতের 'জেলি' মাছ খুঁজে পেয়েছেন। এদের মাথার ছাতার ব্যাস দেড় মিলিমিটার থেকে দু মিটার অবধি হতে পারে। আর শুঁড়ও তেমনি লম্বা। উত্তর মেরুতে এক ধরণের জেলিমাছের শুঁড় কুড়ি থেকে পঁচিশ

মিটার অবধি লম্বা হতে দেখা গিয়েছে। এরা আবার জলের নীচে নিজের গা থেকে এক রকমের সবুজ রং এর আলো বার করে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার এক্ অ্যাকুরিয়ামে একটি মা অক্টোপাস, নিজের ডিমগুলোকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শুঁড়গুলো দিয়ে একটা কৌটো মত বানিয়ে ছিল।

এই কোটোর মধ্যে সে তার ডিমগুলোকে খুব যত্ন করে রাখত—যতদিন পর্যন্ত না ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়।

যেখানে সমুদ্রের জল অপেক্ষাকৃত গরম, সেখানে 'পার্চ' নামের এক ধরণের মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এদের অভ্যাস একটু বিদঘুটে ধরণের। কোন বিপদ এগোচ্ছে দেখলেই মা পার্চ তার বাচ্চাদের প্রথমে মুখের ভেতর পুরে নেয়। তারপর সেখান থেকে দে, চম্পট। মা'র মুখের ভেতরে বাচ্চা পার্চ মাছগুলোর অবশ্য এতে কোন ক্ষতিই হয় না—হাজার হোক মা'ত।

আগেই বলেছি ইলেকট্রিক 'রে', ইলেকট্রিক ঈল, ইলেকট্রিক 'বেড়াল' (cat fish) —এই সব মাছদের একটা বিশেষ প্রত্যঙ্গ আছে। এটা হ'ল এদের শরীরের ভিতরে একটা তড়িৎ কোষ বা ব্যাটারী। এটা দিয়ে এরা শরীরে বিদ্যুৎ তৈরী করতে পারে। আর এই বিদ্যুতের শকের জোরও বেশ ভালো রকমের। এই ক্ষমতা এদের খাবার যোগাড় করতে বা শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা।

'কালামারি' বা 'কাটল' মাছ, আকাশে জেট এরোপ্লেন যে নিয়মে ওড়ে, ঠিক সেই ভাবে নিজেদের শরীরের ভেতর দিয়ে জল পাম্প করে সমুদ্রের ভেতর চলা ফেরা করে। কালামারি মাছ প্রায়ই এই ভাবে জলের ওপরে লাফিয়ে উঠে। বোধহয় সবাইকে দেখাতে চায় যে জেট ইঞ্জিনের মূলসূত্রগুলি তারও অজানা নেই।

সমুদ্রের জলের তলায় মিষ্টি জলের স্রোতের বা ঝরণার কোন কমতি নেই।

পাহাড়ের গান

এই পৃথিবীতে বেশ কিছু পাহাড় আছে যারা গান গায়। আলো ঝলমলে দিন বা ঝোড়ো আবহাওয়া হ'লে, এই পাহাড়গুলো থেকে বাজনার মত একরকম আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এই শব্দ কখনও সুন্দর আর পরিষ্কার, কখনও চিৎকারের মত, আবার কখনও বা অতি মৃদু। এই বাজনা ভালো করে লক্ষ্য করে কেউ কেউ এর মধ্যে বাঁশি বেহালা এমন কি অর্গানের আওয়াজও আলাদা আলাদা করে শুনতে পেয়েছেন। এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে কখনও মনে হয় একপাল কুকুর ডাকছে (হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ) আবার কখনও মনে হয় পায়ের নীচে একসার সুর বাঁধা তারের যন্ত্র রয়েছে। শব্দটা সেই যন্ত্র থেকেই আসছে। [এগ (Eigg) দ্বীপ—হেব্রাইডিস দ্বীপপুঞ্জ।]

পাহাড়ের এই সব গান জন্ম দিয়েছে নানা গল্প কাহিনীর। এদের মধ্যে সবচাইতে প্রচলিত গল্প হচ্ছে অনেকদিন আগের শহর—যা এখন পাহাড়ে ঢাকা—সেখানকার

লোকেরা বা মায়াবী পরীরা, এই সব বাজনা বাজিয়ে নিজেদের কথা সবাইকে জানাচ্ছে—, তাদের ডাকছে।
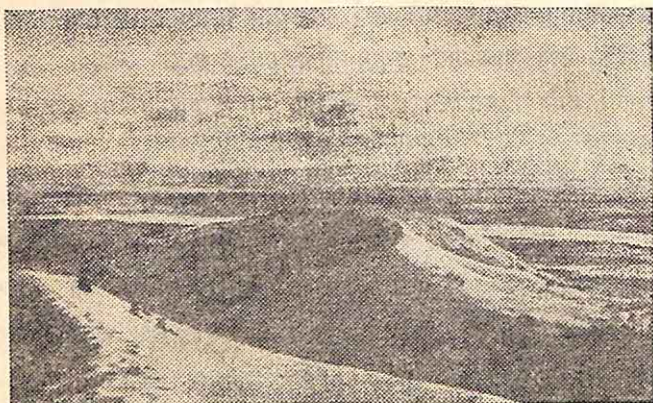
কিছুদিন আগেও চীনের কঙ্গ-সু প্রদেশে পাঁচশ ফুট উচু একটা বালির পাহাড় ছিল। প্রতি বছর এক বিশেষ পরবের দিনে লোকে এই পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠত আর, ওপরে ওঠার পর পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে শ্লিপ কেটে নীচে নামত। নীচে নামবার সময় শোনা যেত বাজের আওয়াজের মত পাহাড়ের গর্জন। পরবটাও ছিল ড্রাগনের ভোজের পরব। কাজেই এই গুরগুর আওয়াজটাও পরবের মেজাজের সঙ্গে বেশ ভালোভাবে মিশে যেত।

সিনাই উপদ্বীপে একটা বালির পাহাড় আছে ওখানকার লোকে তাকে ঘণ্টা পাহাড় বলে। ঐ পাহাড়ে ঘণ্টা বাজানোর মত শব্দ শোনা যায়। শব্দটা বার বার ওঠে আর নামে—তারপর একবারে বাতাসে মিলিয়ে যায়। এর ওপরে উঠতে গেলেই এমনি শব্দ হ'তে থাকে।

পাহাড় যে গান গাইতে পারে এ'কথা প্রথম ধরা পরে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। মার্কো পোলো গোবি মরুভূমি পার হবার সময় শুনতে পান কারা যেন একসাথে কতগুলো ড্রাম পেটাচ্ছে।

১৯৩২ সালে সেণ্ট জন কিলবী নামে একজন ইংরেজ আরব দেশের মরুভূমি পার হবার সময় দেখলেন যে একটি লোক একটা মস্ত উচু বালির পাহাড়ে উঠছে। তার পায়ের চাপে অনেকখানি করে বালি নীচে গড়িয়ে পড়ছে—সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে উঠছে সেই পাহাড়, পরীক্ষার জন্য কিলবী সাহেব সেই বালির মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে আবার

তখনই টেনে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা সাণাই (Trombone) এর করুণ বাগিণীর মত স্বর বেরিয়ে এলো।

পাহাড় যে ঠিক কি কারণে গান গায় সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনও একমত হতে পারেন নি।

ফুলের গোপন কথা

এমন বহু গাছ আছে যারা জমির রাসায়ণিক উপাদান তাদের পছন্দসই একদম ঠিক ঠিক না হলে, সে মাটিতে জন্মাবেই না। আর এ ধরণের মাটিতে এদের পুঁতবার চেষ্টা করলেও কিছুদিনের মধ্যেই মরে যাবে। বিজ্ঞানীরা গাছেদের এই বিশেষ সৌখীনতা লক্ষ্য করে এই গাছদের কাজে লাগিয়েছেন খনিজ সম্পদ খোঁজার কাজে। যেমন আমেরিকার 'সীসে গাছ' (Lead Plant)। এরা থাকেও শুধু সীসের খনির কাছাকাছি। কাজেই সীসে গাছ দেখলেই আশেপাশের মাটির নীচে সীসে পাবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী।

বেলজিয়ামের 'গালমেই ভায়োলেট' (Galmei Violet) ফুল যেখানেই দেখা যাবে সে মাটির নীচে যে দস্তার আকর আছে এ কথাটা যেমন নিশ্চিত, তেমনি জার্মানির 'তারাফুল' (Starflower) খবর এনে দেয় নীচে লুকিয়ে থাকা টিনের আকরের। সোভিয়েত রাশিয়ার কোকপেক (Kokpek) জানান দেয় তেলের অস্তিত্ব আর 'জিপসোফিলা' বলে তামার কথা।

নিকেলের খনির ওপর যদি পাস্ক (Pasque) ফুলের গাছ জন্মায় তবে দেখা যাবে যে সেই ফুলের চেহারা বা তার পাঁপড়ির রং সাধারণ জমিতে পোতা পাস্ক ফুলের থেকে অনেক আলাদা।

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে গোলাপঝাড়ের নীচে তামার কুঁচি পুঁতে রাখলে গাছে ফোটে নীল রংএর গোলাপ।

কাজেই ফুলের গোপন কথা জানতে পারলে বা তাদের ভাষা বুঝতে পারলে সত্যিই সাতরাজার ধন হাতে পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

বাহারে পালক

ভয় পেলে, অনেক পাখী যে তাদের পালকগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে শুরু করে—এ তথ্য অনেকদিন ধরেই জানা। এই সব পাখীদের হঠাৎ তাড়া করলে, বা যখন এরা ঘুমিয়ে থাকে, তখন এদের ঘরে ঢুকে আচমকা খুব বেশী আওয়াজ করলে, ভয়ের চোটে এরা

এদের ল্যাজের পালকের প্রায় সবটাই, এমন কি বেশীর ভাগ ডানার পালকও ঝেড়ে ফেলে দেয়।

আরও দেখা গেছে যে এভাবে পালক ফেলতে পাখীদের কোন কষ্ট ত হয়ই না এমনকি ঝরে যাওয়া পালকের ন্যাড়া জায়গাগুলোও খুব তাড়াতাড়ি নতুন পালকে ঢাকা পড়ে যায়।

নানান ধরণের পায়রা, টার্কী, ক্যানারী প্যাট্রিজ, আরও বহু ধরনের পাখী আছে যাদের পালক এইভাবেই সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু 'ওনাগাদোরি' (Onagadori) বলে এক ধরণের জাপানী মোরগ আছে। তারা যত ভয়ই পাক আর যাই-ই হোক না কেন, কখনও নিজের ল্যাজের পালক খুলে ফেলে না। এই জাতের মোরগ গত দেড়শ বছর যাবৎ জাপানে জন্মানো হচ্ছে।

এদের ল্যাজের বাহারও দেখবার মত। একটা ওনাগাদোরির ল্যাজ, তার সারাজীবন ধরে বেড়ে চলে। মোরগটার ল্যাজ চার বছর বয়েসেই হয়ে পড়ে তিন মিটার লম্বা। সবচাইতে বড় ল্যাজওয়ালা মোরগের ল্যাজের দৈর্ঘ্য সাত মিটার। এই বাহারে লম্বা
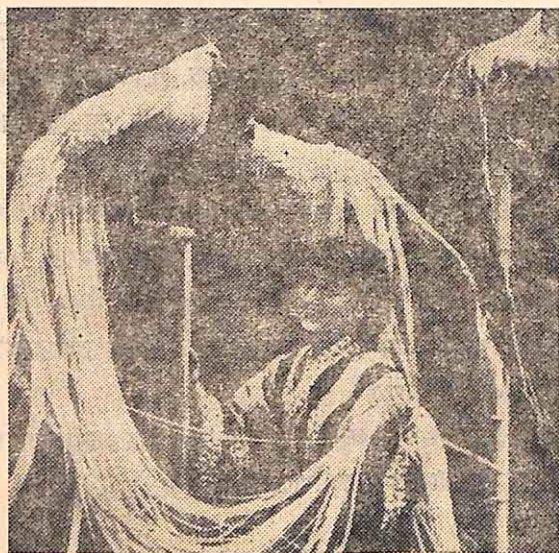
ল্যাজের জন্য পাখীর খাঁচাটা বসানো হয়েছে একটা দোতালা বাড়ীর ছাতের ওপরে, আর সেখান থেকে পাখীর ল্যাজ নেমে এসে ঠেকেছে মাটিতে। এই পাখী জাপানীদের এত প্রিয় পাখী, যে একে মারা বা এর কোন রকম ক্ষতি করা আইনতঃ নিষিদ্ধ।

আমার শিকার

পৃথিবীতে ব্যাংএর জাতভাই আছে—পঞ্চান্ন রকমের। আরও সূক্ষ্ম ভাগ করলে দেখা যাবে যে ব্যাংএর জাতের সংখ্যা প্রায় আটশ। মানুষদের মতই এদের এক এক জাতি এক এক রকম দেখতে। কেউ আড়াই সেণ্টিমিটার লম্বা—আর 'গলিয়াথ' বা ভীম ব্যাং লম্বায় হামেশাই তিরিশ সেণ্টিমিটার। আর এদের লাফের কথা ত জগৎবিখ্যাত। আফ্রিকার ব্যাং একলাফে চার মিটারেরও বেশী চওড়া জায়গা পার হয়ে গেছে, এটা বিশেষ কোন খবরই নয়— অন্ততঃ ওখানকার ব্যাংদের কাছে।

উত্তর আমেরিকার সোণা ব্যাং অবিশ্যি এদের চাইতে অনেক সাধারণ দেখতে। লম্বায় প্রায় দু'শ মিলিমিটার আর ওজনে ছশ গ্রাম। তবে এদের আসল কদর অন্য জায়গায়। লোকে এই ব্যাং এর মাংস খায়—খেতে পছন্দ করে।

আমেরিকার ব্যাং শিকারীরা বছরে এই ব্যাং ধরে প্রায় একশ কোটি। এদের মাংসের মোট ওজন—পঞ্চাশ হাজার টন।

নানা উপায়ে ব্যাং শিকার করা হয়। কখনও জাল দিয়ে, আবার কখনও বা বন্দুক দিয়ে গুলি করে। তবে ব্যাং শিকার করার একটা নিয়মবাঁধা সময় আছে, অন্য সময়ে ব্যাং শিকার বেআইনী। ব্যাং মারলেই তখন পুলিশ ধরবে—আর ফল, শ্রীঘরবাস।

এই ব্যাংদের প্রধান খাবার হচ্ছে ছোটখাট পোকামাকড় আর পুকুরের গেঁড়িগুগলি। তবে ছোট ছোট মাছ, এমন কি খুব ছোট পাখীর বাচ্চা, এসব খেতেও এদের কোন আপত্তি নেই। তবে এগুলো ধরা ব্যাংদের পক্ষে একটু কষ্টকর এই যা সমস্যা।

বসন্তকালে এরা যখন এদের সঙ্গিনীদের ডাকতে থাকে তখন মনে হয় ঠিক যেন একপাল ষাঁড় ডেকে চলেছে। দু'মাইল দূর থেকেও 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর'।

মাছের ঝোল

মাছেদের মত তাপ সহিষ্ণু জীব বড় একটা দেখা যায় না। মেরু সাগরে যেখানে জলের তাপ শূন্যেরও দু ডিগ্রী নীচে সেখানেও তারা আছে, আবার সোভিয়েত রাশিয়ার 'বৈকাল' হ্রদের কাছে 'গোরিয়াচিনস্কি' (Goryachinsky) নামে যে গরম জলের প্রস্রবণ আছে—, যেখানে জলের তাপমাণ চল্লিশ ডিগ্রীরও ওপরে, সেখানেও তারা তেমনি সুখে আছে। ১৯৪৯ সালে এই প্রস্রবণের জলেতে যে সব মাছ দেখা গিয়েছিল, ঐ গরম জলে তাদের যে কোনরকম কষ্ট হচ্ছে—প্রাণীবিজ্ঞানীদের এ'কথা একবারো মনে হয় নি।

ক্যালিফোর্ণিয়ার উষ্ণপ্রস্রবণগুলিতেও সুখে ঘরকন্না করছে আমাদের দেশের রুই

কাতলা মাছেদের এক জাতভাই Carp)। ঘটনাটা একটু আশ্চর্যজনক বইকি। কারণ এই প্রস্রবণের জলের তাপ প্রায় বাহান্ন ডিগ্রী। মানুষ কিন্তু এই জলে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।

পেরেক খোর পাখী

দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেকগুলো উটপাখীর খামার আছে। এমনি এক উটপাখীর খামারে একটা মরা পাখীর পেট থেকে অন্যান্য জিনিষের সাথে এই জিনিষগুলোও পাওয়া যায়। ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া চট, বালি, তিনটে বেশ বড়সড় লোহার টুকরো, নটা তামার পয়সা, একটা তামার কব্জা, দুটো লোহার চাবি, উনত্রিশটা পেরেক—তার সতেরোটা তামার আর বারোটা লোহার, অনেকগুলো সীসের গুলি, বোতাম, কয়েকটা পেতলের ঘণ্টা, আরো কত কি! এই সব জিনিষের মোট ওজন চার কিলোগ্রামেরও ওপরে। পেটে এই জগদ্দল বোঝা নিয়েও কিন্তু পাখীটার স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল—আর অন্যান্য খাবারও সে খেতে পারত বেশ সুন্দর পরিমাণে। কখনই বোঝা যায় নি পেটে এ সব জিনিষ থাকার জন্য তার কোন রকম কষ্ট হচ্ছে।

একটা কাকের পেট থেকে বেরোন হজম না হওয়া জিনিষের তালিকা ঃ—কয়লার টুকরো, ছাই, ভাঙ্গা ইঁটের টুকরো, চা পাতা, ভাঙ্গা কাঁচ, পাথুরে চুন, চামড়ার ফিতে, ভাঙ্গা প্লাস্টিকের আর লোহার পাত, পেন্সিল মোছা রবার, গাছের ছাল বাকল আর আস্তো আস্তো ছোট ছোট ডাল, কাগজ, সুতো, চুল, ডিমের খোলা, সেলোফেন কাগজ আর কিছু তুলোর দলা।

তবে কাক বা উটপাখীর খাবার যে পেরেক বা ভাঙ্গা কাঁচ নয়—তা সবাই নিশ্চয়ই জানে। তবে এ'সব জিনিষ পাখীর পেটে গেল কিভাবে? কিছু জিনিষ অবিশ্যি পাখীটা খাবারের সাথে ভুল করে খেয়ে ফেলেছে। আর কিছু জিনিষ পাখী খেয়েছে জেনে শুনে। এই অদ্ভুত খাবারগুলো জেনে শুনে খাবার কারণ হ'ল এগুলো পাখীর পেটে গিয়ে সাধারণ খাবারকে বেশ ভালো করে পিষে পাখীকে খাবার হজম করতে সাহায্য করে।

ভোজ কর যাহারে

পৃথিবীর এক একটা দেশ যেমন বৈচিত্র্যে ভরা, সেই সব দেশের প্রিয় খাবারগুলোও তেমনি বিচিত্র।

এক দেশের যা সবচাইতে প্রিয় খাবার—অন্য দেশের লোকেরা সেসব খাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

যেমন ধর চীনেরা পাখীর বাসার সুপ খেতে খুব পছন্দ করে। 'সুইফট্' জাতের

পাখীর বাসা দিয়ে তৈরী সূপ খেতেও দারুণ। কেবল একটা কথা। পাখীটা ঐ বাসা তৈরী করেছে নিজের মুখের লালা দিয়ে।

বাহামা ছাড়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সমস্ত দ্বীপগুলোকে একসাথে বলা হয় 'এণ্টাইলিস' (Antilles)। এই এণ্টাইলিসের বাজারে পঙ্গপালের শুটকি উঠলে পরেই, খরিদ্দারও পঙ্গপালের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ে দোকানের ওপর। সুদানে যদি কেউ তোমাকে খুব যত্ন করে খাওয়াতে চায়, তাহলে সে তোমাকে দেবে উইপোকা আর শুঁয়োপোকার তরকারি। অবশ্য এ কথাটা মানতেই হবে যে সমান ওজনের উইপোকায় আছে যে কোন মাংসের চাইতে চারগুণ বেশী ক্যালোরি।

লিবিয়ার লোকেদের একটা ভালো খাবার হচ্ছে পঙ্গপাল রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়ে সেই শুকনো পঙ্গপালের ময়দা দিয়ে রুটি তৈরী করা।

আমেরিকার লোকেরা 'নাসট্যারেয়াম' (Nasturtrium) নামে এক ধরনের জলঝাঁঝির স্যালাড খেতে খুব পছন্দ করে। কখনও কখনও তারা আবার এই জলঝাঁঝির চাটনিও তৈরী করে খায়।

জাভার লোকেদের প্রিয় খাবার হচ্ছে পাখীর বাসা, ছোট বোলতার বাচ্চা আর এক ধরণের শাদা শাদা পিঁপড়ে।

চীনে, পাখীর বাসা ছাড়াও তোমার মিলবে, হাঙ্গরের পাখনার শুটকি, ব্যাংএর শুটকি, কাটল্ মাছ ও তার ডিম, বাঁশের কোঁড়ের স্যালাড। এখন তোমার কপাল যদি খুব ভালো হয় তা হলে এর সাথে পাবে এক প্লেট সামুদ্রিক গুগলি।

ব্যাংএর মাংসের কথা ত আগেই বলেছি। ব্যাংএর ঠ্যাং ফরাসীদের অত্যন্ত প্রিয় খাবার। দেখতেও ঠিক মুরগীর ঠ্যাংএর মত—খেতেও সেই রকম। ফরাসীরা শামুক খেতেও পছন্দ করে। পৃথিবীর সবচাইতে ভালো মাখনের চাইতে শামুকে কুড়িগুণ বেশি ভাইটামিন সি আছে।

পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত মদ হচ্ছে ফরাসী ওয়াইন। এই ওয়াইনের সাথে পনীর সূপ বা ওমলেটের সঙ্গে ব্যাংএর ঠ্যাংএর রোষ্ট, আর এক প্লেট শামুকের মাংস—যে কোন ফরাসীকে তুমি জিজ্ঞাসা করে দেখ না। জিভের জল সামলাতে সামলাতে সে কি উত্তর দেয় ?

কোন দেশের লোকেরা খায় সাপ, কেউ খায় এক ধরনের পোকা। আবার আর এক দল অন্য জাতের পোকার আচার পেলে আর কিছুই খেতে চাইবে না।

একবার প্যারিসের এক নামজাদা রেষ্টুরেন্টে 'মে বাগ' (May bug) বলে একটা পোকার ডিমের পুর দিয়ে এক পিঠে তৈরী করেছিল। যাঁরাই সেই পিঠে খেয়েছেন তাঁরা

প্রত্যেকে বলেছেন যে এটা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। অনেকে আবার দু তিনবার করে চেয়ে খেয়েছেন সেই পোকার পুর দেওয়া পিঠে।
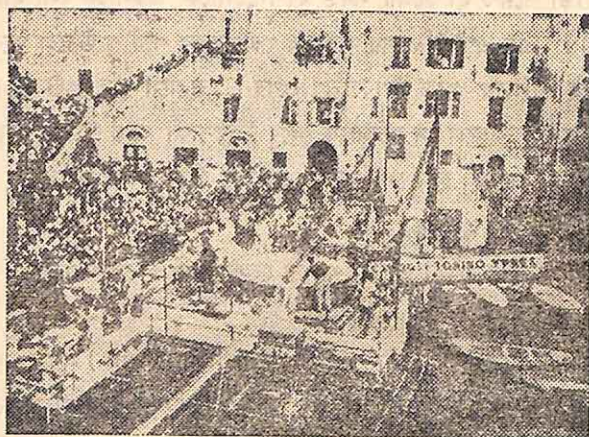
ইতালীর একটা ছোট্ট শহর কামোগ্লি (Camogli)। এই শহরে প্রতি বছর একটা ভোজ হয় তাতে শহরের সমস্ত অধিবাসীকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এই ভোজের জন্য যে
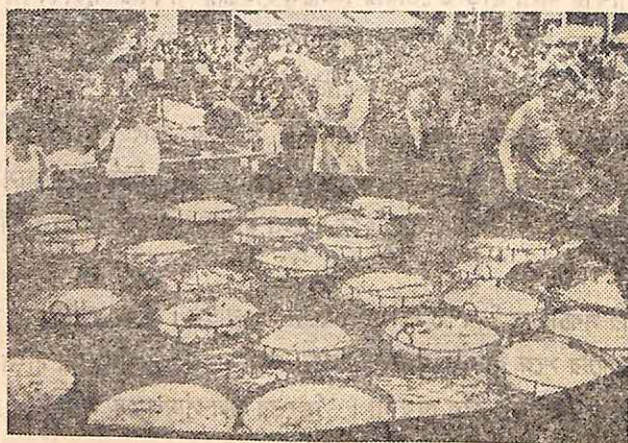
বাসনটায় মাছ ভাজা হয়, সেটার ব্যাস সাড়ে চার মিটার। শহরের মাঝখানের বাগানে উনুন জ্বালিয়ে এই বাসনে মাছ ভাজা হয়—একসাথে পঞ্চাশ হাজার টুকরো মাছ।

এই পঞ্চাশ হাজার টুকরো মাছ ভাজার জন্য প্রয়োজন হয় পাঁচ টন মাছ আর সাড়ে এগারশ লিটারেরও বেশী জলপাইর তেল।

পোকার নামে স্মৃতিসৌধ

'এণ্টারপ্রাইজ' আমেরিকার আলবামা প্রদেশের একটা শহর। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল তুলোর চাষ। বেশ শান্তিতেই কাটছিল ওদের সময়।

হঠাৎ ওদের এই শান্তির নীড়ে দেখা দিল এক ঝাঁক গুবরে পোকা। এরা সাধারণ গুবরে পোকা নয়—এরা তুলোর গাছ নষ্ট করার যম। এরা কোন তুলো গাছের গুঁড়িতে লাগলে পরে সে গাছের একেবারে দফারফা শেষ করে দেয়। এই পোকার দল তছনছ করে দিল এণ্টারপ্রাইজের সমস্ত তুলোর ক্ষেত। বাঁচাবার নানা চেষ্টা করেও লোকে যখন কোন ভাবেই তাদের তুলোর গাছগুলিকে রক্ষা করতে পারল না, তখন নিরুপায় হয়েই তারা শুরু করল অন্য শস্যের চাষ। আর সবচাইতে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই অন্য শস্য এখানকার লোকেদের এনে দিল এত প্রচুর লাভ যে তুলোর চাষ করে তাদের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব ছিল না।

লোকের মন ভরে উঠল খুশীতে। যে পোকাকে তারা মনে করেছিল যে তাদের উপার্জনের পথ বন্ধ করার অগ্রদূত বুঝতে পারল যে সে আসলে তাদের বন্ধু—বেশী উপার্জনের উপায় জানানোর জন্যই সে এদের শহরে এসেছিল।

কৃতজ্ঞ লোকেরা উপকারী পোকার স্মৃতিতে বানালো একটা সুন্দর স্মৃতিসৌধ। এই মিনারের নীচে যে পাথরের ফলক লাগানো আছে তাতে খুব সুন্দর ভাষায় লেখা আছে এণ্টারপ্রাইজ শহরের সমস্ত লোকের কৃকজ্ঞতা —তুলোর ক্ষেত ধ্বংসকারী এই গুবরে পোকার উদ্দেশে।

অষ্ট্রেলিয়ার বারনার্গা শহরে একটা শুঁয়োপোকার সম্মানে একটা মিনার গড়া হয়েছে।

গত শতকে 'ওপুন্‌শিয়া' (Opuntia) নামে ফণীমনসা জাতের এক ধরনের কাঁটাগাছ অষ্ট্রেলিয়ায় আমদানী করা হয়। এই গাছের ফলগুলো দেখতে বেশ সুন্দর তাই বহু চাষী তাদের ক্ষেতের বেড়া দেবার জন্য এই গাছ লাগানো শুরু করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বেড়ার গাছ বেড়ার লাইনে না থেকে যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠতে শুরু

করে। চাষীরাও প্রাণপণে চেষ্টা শুরু করে এ' অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। গাছ কেটে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে—এমনকি কাঁটাগাছের ঝোপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে—
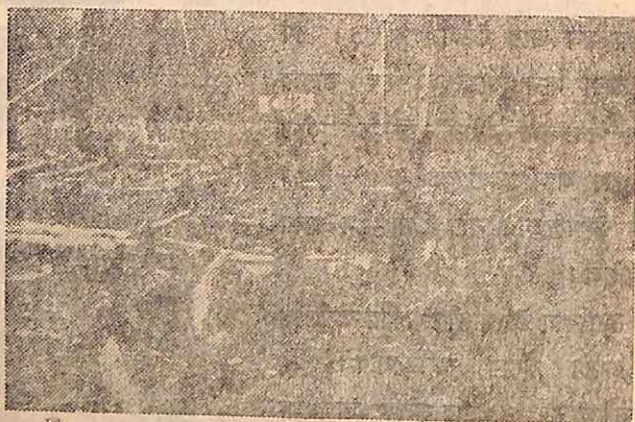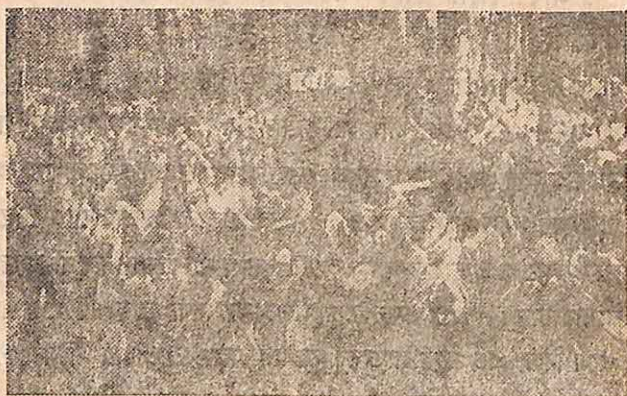
সব চেষ্টাই করা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। কাঁটাগাছের বন ক্রমশঃই বেড়ে চলে। শেষকালে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় খুঁজে পাওয়া গেল এই কাঁটাগাছের বন। 'পাইরোলিডিডে' জাতের মথের এক প্রজাতি 'ক্যাকটোব্লাসির্টস্' (Cactoblastis) এর ডিমের থেকে বেরোল এক শুয়োপোকা। আর এই পোকার কি আশ্চর্য ক্ষমতা? এরা যে শুধু ওপুনশিয়া গাছে গিয়ে বাসা বাঁধল তাই নয় এদের খাবারও হল ঐ গাছের রস আর এই গাছের ডালপালা। দশ বৎসরের মধ্যে এই শুয়োপোকার দল সমস্ত বুনো কাঁটাগাছ খেয়ে শেষ করে দিল। সেই বিপদমুক্তির আনন্দে আর মুক্তিদাতা শুয়োপোকাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যই এই মিনার।

সোনার মাছ

জাপানের কৃষিদপ্তর এক ইস্তাহার ছাপিয়ে জনসাধারণকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে জাপানের যে সব প্রদেশে খুব ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় সেখানকার লোকেরা যেন ভূমিকম্পের হাত থেকে বাঁচবার জন্য নিজের নিজের বাড়ীর অ্যাকুরিয়ামে এক বিশেষ ধরনের ছোট শাদা মাছ পোষেন। কারণ দেখা গিয়েছে যে ভূমিকম্প হবার অনেক আগে থেকেই এই মাছেরা এমন ছটফট করতে থাকে যে মাছের এই ছটফটানি লোকের চোখে পড়বেই আর লোকেও তখন আগে ভাগেই সাবধান হয়ে যেতে পারবে।

ভূমিকম্প জাপানে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কোন কোন অঞ্চলে বছরে ভূমিকম্প হয় বছরে তিন থেকে পাঁচবার। কাজেই ছোট্ট শাদা মাছটির এই অসাধারণ ক্ষমতা একে জাপানীদের কাছে সোনার মাছের চাইতেও বেশী দামী করে তুলেছে।

মাছেরা শুধু ভূমিকম্পের খবরই নয়, আবহাওয়া সম্পর্কেও খবর দিতে পারে।

চীন দেশের এক ধরনের মাছ আকাশে মেঘ জমবার অনেক আগে থেকেই শুরু করে তার ছটফটানি। আর যদি বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে তা হলে ত তার দৌড়াদৌড়ির সীমা থাকে না। এই জীবন্ত ব্যারোমিটার অধিকাংশ সময়েই সঠিক খবর দেয়—তা খবরের কাগজে যাই লেখা থাক না কেন। শতকরা মাত্র তিন থেকে চার বার এই মাছের ভবিষ্যদবাণী ভুল হ'তে দেখা গিয়েছে।

তিমির পিঠে চাপড়

দক্ষিণ মেরুর গুস্তাভ প্রণালী, যা নাকি জেমস রস দীপ আর গ্রাহামের জমির মাঝ-

খানে, হঠাৎ একবার শীতে জমে যায়। আর এই জমে যাওয়া বরফে আটকা পড়ে একদল
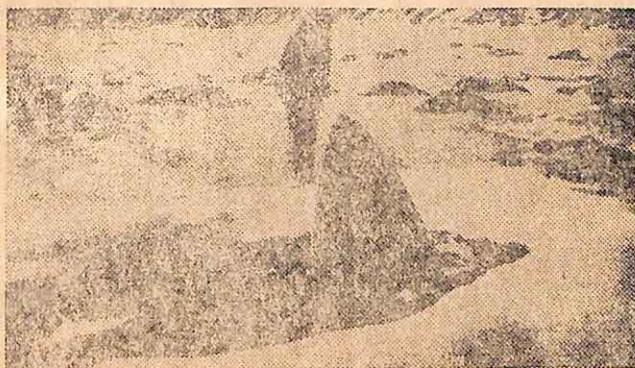
তিমি মাছ। নিঃশ্বাস নেবার জন্য তিমিগুলো বরফের ফুটোর মধ্য দিয়ে তাদের মাথা গলিয়ে নিজেদের মাথাটাকে জলের বাইরে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

একদল বৃটিশ অভিযাত্রী সেই সময় তিমির পিঠে হাত বোলানোর বা চাপড় মারবার সুযোগ পান।

বরফ যে সর্ব্বদা ধবধবে শাদা হবে এমন কোন মানে নেই। খালি চোখে না দেখতে পাওয়া গেলেও জলে ভাসা শ্যাওলার রঙে বরফের রং লাল নীল সবুজ এমন কি কালো রংএর পর্যন্ত হতে পারে। হাওয়ায় ভেসে আসা ধুলো, ঝুল বা ছাইও অনেক সময় বরফের রংকে কালো করে দেয়।

—কথা শেষ—